রবীন্দ্রনাথের গীত-বাণী : বেলা-অবেলার অভয় মন্ত্র

রেজাউল করিম তালুকদার (তারেক রেজা)*

রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীতে ভর দিয়ে দূরে কোথাও হারিয়ে যাওয়া, সুরের আশ্রয়ে সীমাহীন শূন্যতায় উড়ে বেড়ানো কিংবা গীত-আশ্বাসে দুর্দিন-দুঃসময়ে ঘুরে দাঁড়ানোর আনন্দ যেমন অপার, তেমনি এই গীত-বাণীর সান্নিধ্য লাভের বেদনাও বিস্ময়করভাবে সীমাহীন। রবীন্দ্র-সংগীতের সমুদ্রে ডুব দিয়ে জীবনের যাবতীয় সঞ্চয় এবং তার সার্থকতা বিবেচনা করার বিপদ এই যে, এতে অনায়াসেই আমরা ব্যক্তিগত ভূখণ্ডের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি এবং আমাদের অনধিকৃত বিশ্বের বিপুল আয়োজন থেকে বঞ্চিত থাকার দুঃখে আমরা ভারাক্রান্ত হই। রবীন্দ্রনাথ দুঃখকেও আনন্দের অধিক রমণীয় করে তুলেছেন, বলেছেন, 'আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন'। দুঃখকে ভালোবেসে বুকে ধারণ করার দুঃসাহস যাঁর আছে, তাকে তো রবীন্দ্রনাথের কাছে আসতেই হবে। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও অর্জনকে বাণীবদ্ধ করেছেন তিনি, আর যা-কিছু তাঁর ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে গেছে তার অমৃত-আস্বাদকেও তিনি আনন্দের সঙ্গেই শিল্পের অবয়ব দিয়েছেন। সাহিত্যের সকল পথেই তাঁর পায়ের চিহ্ন প্রবল এবং প্রাতিস্বিক। পাঠের ভেতর দিয়ে তিনি বাঙালির প্রাণের মানুষ সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর গানের ভেতর দিয়ে রবীন্দ্র-বিশ্বের যে সৌরভ ও সমৃদ্ধির সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে, সেখানে তিনি তারও বেশি কিছু, আমাদের প্রাণাধিক শিল্পস্রষ্টা।

কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি বিশ্বজোড়া হলেও নিজের অন্তর্গত উপাসনা ও উপলব্ধিকে তিনি সংগীতের মধ্য দিয়েই সম্পন্ন করার প্রয়াস পেয়েছেন। গীতসুধার জন্য আমৃত্যু তৃষিত ছিলেন তিনি। এই তৃষ্ণা নিবারণের নানা আয়োজনের মধ্যেই নির্মিত হয়েছে তাঁর শিল্পিসত্তার মৌলকাঠামো। সমালোচক যথার্থই বলেছেন : 'রবীন্দ্রনাথ মূলত কবিরূপে বিশ্বস্বীকৃতি পেলেও গানের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশের সাধনা ও নিরীক্ষা তিনি বিশেষভাবে করে গেছেন।' (সুধীর, ১৩৯৭ : ২৬)। বলার অপেক্ষা রাখে না, রবীন্দ্রনাথের পাঠক যত, তার চেয়ে তাঁর শ্রোতার সংখ্যা অধিক। এমন কোনো বাঙালি নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার কান সক্রিয় অথচ রবীন্দ্রনাথকে শ্রবণ করেন নি।[১] রবীন্দ্রনাথের বিশ্বদর্শনও গানের আশ্রয়েই সম্পন্নতা লাভ করেছে বলে দাবি করেছেন তিনি, বলেছেন, 'গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি/তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি।/তখন তারি আলোর ভাষায় আকাশ ভরে ভালোবাসায়,/ তখন তারি ধুলায় ধুলায় জাগে পরম বাণী ॥'[২] (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২৬/১৫-১৬)। পরম স্রষ্টাকে অন্তরে ধারণ করার যে গীত-বাণী, রবীন্দ্রনাথকে চেনা-জানার জন্য আমরা সেই বাণীরই শরণ নিতে চাই। এক্ষেত্রে আমরা তাঁর গানকে সুর-তাল-লয়ের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে কেবল বাণীর আশ্রয়ে আমাদের বিবেচনাকে উপস্থাপনের প্রয়াস

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

পাব। এমনকি তাঁর সমগ্র গানের বাণীকেও আমরা এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করার দুঃসাহস দেখাব না। রবীন্দ্রনাথের পূজা-পর্যায়ের গীত-বাণীতে পূজার অর্ঘ্য হিসেবে গানের গতিবিধি ও গভীরতা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তাঁর নিবেদন ও নির্মাণের নিজস্বতা সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করব এবং সংগত কারণেই এই পর্যবেক্ষণেও আমরা বারবার রবীন্দ্রনাথের সংগীত-চিন্তারই শরণ নেব। সেই অর্থে আমাদের এই রচনায় রবীন্দ্রনাথকে অনেকাংশেই রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা লক্ষ করা যাবে। প্রসঙ্গত স্মরণ করি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের একটি উজ্জ্বল উক্তি : 'আসলে আমাদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের মূল্য-নিরূপণ গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার চেয়েও হাস্যকর।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ২৭১)। এই হাস্যকর আয়োজন আমাদের বিস্ময়কর কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে প্রাণিত করবে না জানি, তবু আমাদের একটুখানি হৃদয় বিরাট রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মুক্তির আনন্দে উদ্ভাসিত হতে ভালোবাসে। আমাদের এই লেখায় সেই ভালোবাসারই ছিটেফোটা হয়তো প্রদর্শিত হবে। রবীন্দ্রনাথের যে গান কানের ভেতর দিয়ে শ্রোতার মরমে প্রবেশ করে, সেই গানের বাণী পাঠকের প্রাণকে কীভাবে পল্লবিত করে, এই রচনায় আমরা তারও খোঁজখবর নেয়ার চেষ্টা করব।

গীতবিতান-এর 'পূজা'-পর্যায়ের গানে রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টার কাছে কেবল সমর্পিতই হন নি, স্রষ্টার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের নানা মাত্রা নিরূপণের মাধ্যমে বিচিত্র ধরনের বোঝাপড়ায় সচেষ্ট হয়েছেন তিনি। এই পর্যায়ের রচনাবলিকে কেবল অধরা ভগবান বা দেবতা ভেবে প্রণতি জানানোর প্রয়াস হিসেবে পাঠ করলে রবীন্দ্রনাথের গীত-বাণীর অর্থ ও তাৎপর্য সন্দেহাতীতভাবে খণ্ডিত হয়ে পড়ে। কবির পূজা প্রকৃত অর্থে নিবেদন বা সমর্পণের প্রতিভূ হিসেবে প্রকাশিত। তাই তাঁর পূজার গানকে পরবর্তী অন্যান্য পর্যায়ের গানের ভূমিকা বলা যেতে পারে। সমালোচক যথার্থই বলেছেন :

> আসলে 'পূজা' রবীন্দ্র-সংগীতের সব পর্যায়ের মুখবন্ধ, সর্ব রসের মূলাধার। বৈষ্ণব কবির বিপরীতক্রমে তাঁর গানে মধুর-আদি সব লৌকিক রসই ঊর্ধ্বায়িত হয়ে উঠেছে এক অলৌকিক পূজা নিবেদনে। প্রেয়সীর প্রেমে যে অপ্রাপনীয়ের আভাস তিনি পান, পার্থিব প্রকৃতিতে যে প্রাণময় লীলা-রহস্য অনুভব করেন, তারই মধ্যে অন্তর্লীন হয়ে থাকে 'পূজা'র বিন্দ্র অনুষ্ঠান। (জয়ন্তী, ১৩৯২ : ২৪)

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র নিবেদনের মধ্যেই দেবতা ও প্রিয় পরস্পরের হাত ধরে পথ চলেছে, এই দুইয়ের মধ্যে বিশেষ কোনো বৈপরীত্য বা ভেদরেখা স্বীকার করেন নি তিনি।[৩] *সোনার তরী* কাব্যের 'বৈষ্ণবকবিতা'য় তিনি আমাদের জানিয়েছেন : 'দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই/প্রিয়জনে — প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই/তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা।/ দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।'[৪] (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ২/৪২)। পূর্ণাঙ্গ সমর্পণের মাধ্যমেই প্রেম সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে এবং তা সার্থকতার সারস্বত অভিব্যক্তি লাভ করে প্রেমিককে সৃষ্টিশীল করে তোলে। এই সৃষ্টির আনন্দ যেমন উপভোগ্য হয়ে ওঠে, তেমনি এর বেদনাও বৈনাশিক নয়, সৃজনশীল অর্থাৎ তা তৃপ্তিদায়ক। তাই এই গীত-বাণী কণ্ঠে ধারণ

করে একজন মুগ্ধ প্রেমিক অনায়াসে উচ্চারণ করতে পারেন : 'আমি মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে/আমার ভয়ভাঙা এই নায়ে ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১৯৯/৮৯)। যাঁর অন্তরে একবার এই ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রেরণা সঞ্চারিত হয় তিনি ছেঁড়া পাল কিংবা ভাঙা হালেও অবলীলায় অন্যপারের দিকে যাত্রা করতে পারেন। কারণ, তাঁর পথ ভুল করার ভয় নেই। রবীন্দ্রনাথ জানেন, এই বিপদ-সংকুল পথে যিনি তাঁকে আহ্বান করেছেন, পথ দেখানোর দায়িত্ব তিনি কিছুতেই এড়াতে পারেন না। পূজা পর্যায়ের ১৯০-সংখ্যক গানেও আমরা লক্ষ করি ঝড়ের ঝাপটা উপেক্ষা করে কবির মুক্তি-প্রত্যাশী প্রাণ গলা ছেড়ে গান গেয়ে ওঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করছে। এই মুক্তি কবির বিচিত্র ভাব ও চৈতন্যের দ্যোতক এবং তা বিশেষ গন্তব্যের দিকেই পথনির্দেশ করছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা অর্জনের জন্য যে আপসহীন মানসিক শক্তি আবশ্যক, কবি সেই দিকেই নিজের মনকে চালিত করতে চাইছেন। কবির কবিতা ও গানে বারবার এপার-ওপারের প্রসঙ্গ উচ্চারিত হয়েছে। 'আসা-যাওয়ার পথের ধারে' বসে কবি মানবজীবনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং এই পর্যবেক্ষণ-প্রসূত অভিজ্ঞতাই তাঁর নানা রচনায় চারুকৃত। পরপারের ডাক একদিন আসবেই এবং এই ডাকে সবাইকেই একদিন সাড়া দিতে হবে। তাই তাড়া করে পারের পাথেয় সংগ্রহের কথা স্মরণ করছেন কবি। নিজের উদ্দেশে কবির এই সতর্কবাণী বা নির্দেশনায় যে সার্বজনীন সত্যের প্রকাশ ঘটেছে, সেই সত্যই এই গানকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে — এমনটি ভাবলে কবির শক্তির প্রতি অমর্যাদা করা হয়। আনন্দের সঙ্গে আঘাত সহ্য করে দারুণ দুঃসময়েও কণ্ঠে গানকে ধারণ করার যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছেন কবি, সেখানেই তাঁর সৃষ্টির সার্থকতা : 'এই কথাটা ধরে রাখিস — মুক্তি তোরে পেতেই হবে।/যে পথ গেছে পারের পানে সে পথে তোর যেতেই হবে ॥/অভয় মনে কণ্ঠ ছাড়ি গান গেয়ে তুই দিবি পাড়ি,/খুশি হয়ে ঝড়ের হাওয়ায় ঢেউ যে তোরে খেতেই হবে।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১৯০/৮৬)। রবীন্দ্রনাথের গানে এই ঝড়ের হাওয়া ও তরী বাওয়ার প্রসঙ্গ বারবার ব্যবহৃত হলেও প্রত্যেক গীত-বাণীতেই তার ভাবার্থ ও ব্যঞ্জনা পাঠক-শ্রোতাকে নতুন অনুভব উপহার দেয়। জীবনকে নদী কিংবা সমুদ্র হিসেবে উপস্থাপনের রীতি নিশ্চয়ই নতুন নয় কিন্তু জীবন-তরীকে সাফল্যের সঙ্গে তীরে বা গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য তিনি মাঝির দক্ষতার ওপরই নির্ভর করেছেন। 'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা'— *গীতাঞ্জলি* কাব্যে আত্মপ্রত্যয়ী কবির এই উচ্চারণ তাঁর গীত-বাণীর মাঝিদেরও মনের কথা। তাই জীবন-সন্ধ্যায়ও ওপার-পানে বেয়ে চলা মাঝির কণ্ঠে গান জেগে ওঠে, চোখের জলের ঢেউয়ের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উত্তাল দৃশ্য একাকার হয়ে যায়, ব্যথার বাঁশি বাজিয়ে পারের তরী ভাসিয়ে দেন কবি। পালে যখন হাওয়া লাগে তখন কবি তাঁর মন-মাঝিকে শক্ত হাতে হাল ধরার পরামর্শ দেন। এই মাঝি বোধকরি তাঁর জীবনদেবতারই প্রতিনিধিত্ব করছে, তাই সারাদিনের ব্যস্ততা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি নীরবে কান পেতে শোনেন পারের হাওয়ায় বেজে ওঠা গান। সেই পারের ঘাটে যে অন্ধকার, তা তাঁর সুরের স্রোতে হারিয়ে যায়। তাই 'যে সাগরপানের বাণী' কবির পরানে এসে পৌঁছোয় সেই বাণীর স্পর্শে অরণ্যপর্বতও গান গেয়ে ওঠে। মাঝি, নৌকা পাল, নদী, সাগর, ঝড়ের

রূপকল্পে জীবনের বিরূপ বাস্তবতা চিত্রণ এবং গানের অভয় বাণীকে আশ্রয় করে গন্তব্যে পৌঁছানোর প্রতিজ্ঞায় কবির দৃষ্টিভঙ্গি ও দিকনির্দেশনার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। আমরা আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত বিবেচনা করতে পারি :

ক. দেখি সন্ধ্যাবেলা ও পার-পানে তরণী যাও বেয়ে।
দেখে মন যে আমার কেমন করে, ওঠে যে গান গেয়ে
ওগো খেয়ার নেয়ে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১৪৭/৬৮)

খ. আনন্দগান উঠুক তবে বাজি
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।
অশ্রুজলের ঢেউয়ের 'পরে আজি
পারের তরী থাকুক ভাসিতে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩০৯/১২৯)

গ. একি গভীর বাণী শিখালে সাগরে,
কী মধুগীতি তুলিলে নদীকল্লোলে!
একি ঢালিছ সুধা, মানবহৃদয়ে,
তাই হৃদয় গাইছে প্রেম-উল্লাসে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৪৭৪/১৮৭)

ঘ. হাওয়া লাগে গানের পালে
মাঝি আমার বোসো হালে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৫৬০/২২০)

ঙ. কাটল বেলা হাটের দিনে
লোকের কথার বোঝা কিনে।
কথার সে ভার নামা রে মন, নীরব শোন্ দেখি শোন্
পারের হাওয়ায় গান বাজে কোন্ বীণার তারে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৫৬৬/২২৩)

চ. আজি বিজন বাটে, অন্ধকারের ঘাটে
সব-হারানো নাটে এনেছি এই গান হায় হায় ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৫৬৯/২২৪)

ছ. মোর পথিকেরে বুঝি এনেছ এবার মোর করুণ রঙিন পথ!
এসেছে এসেছে আহা অঙ্গনে এসেছে, মোর দুয়ারে লেগেছে রথ ॥
সে যে সাগরপারের বাণী মোর পরাণে দিয়েছে আনি, আহা
তার আঁখির তারায় যেন গান গায় অরণ্যপর্বত ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৫৭৯/২২৮)

রবীন্দ্রনাথ *সোনার তরী* কাব্যের নাম-কবিতায় বলেছেন, 'গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!/দেখে যেন মনে হয়, চিনি উহারে।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ২/১৭) — এই চেনার মধ্যে 'মনে হয়' যে অপরিচয়ের মৃদু আভাস দেয়, গীত-বাণীতে কবি সেই মাঝিকেই নানাভাবে আবিষ্কার ও উপলব্ধির চেষ্টা করেছেন। জীবনের যাবতীয় আনন্দ ও বেদনাকে গানের ভেতর দিয়ে দেখার দৃষ্টি কবিকে স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত শিল্পস্রষ্টায় পরিণত করেছে বলেই কবির গানের শ্রোতা হিসেবে যেমন, তেমনি তাঁর গীত-বাণীর পাঠক হিসেবেও আমরা তাঁকে প্রণতি জানাই।

রবীন্দ্রনাথের *গীতবিতান*-এর 'পূজা'-পর্যায়ে কবির আত্মনিবেদনের নানা আয়োজন লক্ষ করার মতো। তাঁর দেবতা কিংবা প্রিয় যেমন বিশেষ কোনো রূপে সীমাবদ্ধ থাকে নি, তেমনি তাঁর নিবেদনের ভঙ্গিও বিচিত্র অবয়বে চিত্রিত। সংগীতের দর্পণে বিশ্বস্রষ্টাকে অবলোকনের ইচ্ছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সংগীত-স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ মূলত তাঁর অন্তর্গত ঐশ্বর্যের সঙ্গেই পাঠক-শ্রোতার মেলবন্ধন রচনার প্রয়াস পান। 'ঘরে আমার রাখতে যে হয় বহু

লোকের মন—/অনেক বাঁশি, অনেক কাঁসি, অনেক আয়োজন।/বঁধুর কাছে আসার বেলায় গানটি শুধু নিলেম গলায়,/তারি গলার মাল্য ক'রে করব মূল্যবান ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২০/১৩) — এই গানে আমরা লক্ষ করছি, তিনি তাঁর পরান-বঁধুর গলায় গানের মালা পরিয়ে দিতে চান। আবার এই পরান-বঁধু যদি মুখ ফিরিয়ে নেন, তবু তিনি হাল ছাড়তে নারাজ। তাঁর পথ আগলে বসে থাকবেন তিনি, যাতে কিছুতেই তাঁর জীবনদেবতা তাঁকে এড়িয়ে যেতে না পারেন। স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের সাধনায় নিবেদিত কোনো মহৎ হৃদয়ের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হলে সেই সাধক তাঁর স্রষ্টার উদ্দেশে যে মাল্য রচনা করবেন তাতে কুসুম সরবরাহ করেই তৃপ্ত হবেন কবি : 'নাই বা ডাকো রইব তোমার দ্বারে,/মুখ ফিরালে ফিরব না এইবারে ॥/বসব তোমার পথের ধুলার 'পরে,/এড়িয়ে আমায় চলবে কেমন করে–/তোমার তরে যে জন গাঁথে মালা/গানের কুসুম জুগিয়ে দেব তারে ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১৪২/৬৬)। রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্বস্রষ্টা, তিনিও ভারতীয় ধর্মসাধনার বিচিত্র প্রবণতাকে সাঙ্গীকৃত করে নতুন রূপে-লাবণ্যে কবির কাছে ধরা দিয়েছেন। এ-প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে :

> বস্তুত রবীন্দ্রনাথের পূজাসংগীত একটি বিপুল ভাবসম্পদ। উপনিষদ থেকে ভারতীয় সাধনার বিভিন্ন ধারা, সত্য-শিব-সুন্দরের আদর্শ, সুফীধর্মে ঈশ্বরকে প্রেমিকরূপে দেখার কল্পনা, মরমী সাধকদের দেহসচেতন আধ্যাত্মিক অনুভূতি, বৈষ্ণবীর অভিসার — রবীন্দ্রনাথ সবই তাঁর ভক্তিসংগীতে গ্রহণ করেছিলেন। তবু তাঁর কোন সংগীতই উপনিষদের শ্লোকানুবাদ বা নানকের ভজনের বঙ্গীয় তর্জমা নয়। সমস্ত সাধনার ধারাই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভক্তিচেতনায় মিলিত হয়ে একটি যৌগিক ধর্মানুভূতি গড়ে তুলেছে। (করুণাময়, ১৯৯৩ : ৫১)

রবীন্দ্রনাথের ধর্মানুভূতির এই যৌগিক প্রবণতা তাঁর গানের বাণী-বিন্যাসেও বৈচিত্র্য সঞ্চার করেছে। তাই সৃষ্টিকর্তার অসীম অবদানকে তিনি অবলীলায় নিজের সীমাহীন সৃজনপ্রতিভার সমান্তরালে স্থাপন করেছেন, ঘোষণা করেছেন : 'আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব—/ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ, জীবন নব নব ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৫৪/২৮)। আবার কখনো-বা লক্ষ করি, ভগবানের হাতের বাঁশি হিসেবে তাঁর দায়িত্ব কেবল স্রষ্টার ইচ্ছের অনুকূলে বেজে ওঠা। একই গীত-বাণীতে তিনি বলছেন : 'কত-যে গিরি কত-যে নদী-তীরে বেড়ালে বহি ছোটো এ বাঁশিটিরে,/কত যে তান বাজালে ফিরে ফিরে/কাহারে তাহা কব ॥' এই বাঁশিই আবার ভগবানের হাতে তুলে দিয়ে বন্ধুর পথে পা বাড়িয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। পাথর-ছড়ানো পথে তিনি রক্তাক্ত হলেও তাঁর প্রকাশ বেদনাবিহ্বল নয় বরং স্রষ্টার 'ঝর্না-ঝরানো' বাণী শুনতে পেয়েছেন তিনি : 'আমার বাঁশি তোমার হাতে ফুটোর পরে ফুটো তাতে—/তাই শুনি সুর এমন মধুর পরান-ভরানো ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৫৭০/২২৪)। এই 'পরান-ভরানো' সুরের টানেই রবীন্দ্রনাথ অজানাকে জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন, নানা ঘরে আশ্রয় নিয়ে তাঁর পরম সুন্দরকে হৃদয়ের অন্দরমহলে বসিয়ে বলেন, 'দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩৬৬/১৫২)। রবীন্দ্রনাথের গীত-বাণীও মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবধান মোচনের মন্ত্র হিসেবে কাজ করে। তাঁর গানের বাণী মানসিক মুক্তির লক্ষ্যে বিবিধ প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করার উজ্জ্বল অনুরণন।

কবিতা ও সংগীতের পার্থক্য সত্ত্বেও, স্বীকার করতেই হবে, এই দু'য়ের মধ্যে গভীরতর সম্পর্ক বিদ্যমান। এ-সম্পর্কে *সংগীত* গ্রন্থের 'সংগীত ও ভাব' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য : 'আমরা যখন কবিতা পাঠ করি তখন তাহাতে অঙ্গহীনতা থাকিয়া যায়; সংগীত আর কিছু নয় — সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে কবিতা পাঠ করা।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ১৭/৩১৬)। যদিও এই প্রবন্ধেই তিনি বলেছেন, গানের কবিতা অর্থাৎ গীত-বাণী ও সাধারণ কবিতা বিচার করার তুলাদণ্ডটি ভিন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবু গানের কবিতা বলার মধ্যেই কবিতা হিসেবে গানের বাণীর সম্মান স্বীকৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এখানে গানের কবিতা বা সংগীতকে কবিতা পাঠের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় বলতে বোধকরি গানের সুর-তাল-লয়ের আনুগত্য বুঝিয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গীত-বাণীকে সংগীতের অন্যান্য অনুষঙ্গ থেকে মুক্তি দিলেও উৎকৃষ্ট কবিতা হিসেবেই তা পাঠককে পরিতৃপ্ত করে। পাঠকের অতৃপ্তিকেও উস্কে দেয় তাঁর গীত-বাণী। এই অতৃপ্তি অনুসন্ধিৎসারই অন্য নাম। 'গানের কবিতা পড়িয়া বিচার না করাই উচিত'— রবীন্দ্রনাথের এই সতর্কবাণী সত্ত্বেও বাংলা কবিতার পাঠকমাত্রই জানেন, যাঁর কণ্ঠ নেই, কিংবা যাঁর কানও যথেষ্ট সতর্ক নয়, কেবল পাঠের ভেতর দিয়ে রবিরশ্মির উষ্ণতায় পল্লবিত হতে চান যিনি, তাঁর কাছেও রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী বিশেষ তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয় এবং তাঁর প্রাণে তা অনাস্বাদিত প্রণোদনা সৃষ্টি করে।[৫] রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশের গানের প্রধান প্রবণতা হিসেবে বাণীর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে গানের বাণীকে কবিতার অনুচর নয়, সহচর হিসেবে স্বীকৃত দিয়েছেন। এ-প্রসঙ্গে *সংগীতচিন্তা* গ্রন্থের 'আমাদের সংগীত' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

> আকাশে মেঘের মধ্যে বাষ্পাকারে যে জলের সঞ্চয় হয়, বিশুদ্ধ জলধারা-বর্ষণেই তার প্রকাশ। গাছের ভিতর যে রস গোপনে সঞ্চিত হতে থাকে, তার প্রকাশ পাতার সঙ্গে ফুলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। সংগীতেরও এই রকম দুই ভাবের প্রকাশ। এক হচ্ছে বিশুদ্ধ সংগীত আকারে, আর হচ্ছে কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। মানুষের মধ্যে প্রকৃতিভেদ আছে, সেই ভেদ অনুসারে সংগীতের দুই রকমের অভিব্যক্তি হয়। তার প্রমাণ দেখা যায় হিন্দুস্থানে আর বাংলা দেশে। কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলা দেশে সংগীত কবিতার অনুচর না হোক সহচর বটে। (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ১৬/৫৩৭)

এই প্রবন্ধে তিনি উল্লেখ করেছেন, সাহিত্যেই বাংলা দেশের মানুষের হৃদয়ানুভবের প্রকাশ ঘটে। তাই তিনি মাইকেল মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধ কাব্যের* 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'—এই উক্তির বরাত দিয়ে বলেছেন, 'বাণীর প্রতিই বাঙালির অন্তরের টান; এইজন্যেই ভারতের মধ্যে এই প্রদেশেই বাণীর সাধনা সব চেয়ে বেশি হয়েছে।' এই সাধনায় রবীন্দ্রনাথও আমৃত্যু নিজেকে নিমগ্ন রেখেছেন। তাই তাঁর গান সুরের দাসত্ব স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যাক রবীন্দ্রসংগীতের বাণী-বিষয়ে কবি শামসুর রাহমানের মন্তব্য :

> রবীন্দ্রসংগীতে বাণী কখনো তুচ্ছ নয়, রবীন্দ্রনাথের গানে কখনো সুরের এমন স্পর্ধিত ওড়াউড়ি দেখি না যা কথাকে পেছনে ফেলে আসে বহুদূর। সুর বিষয়ে কিছু বলা আমার পক্ষে সমীচীন নয়। কারণ সুরের ব্যাকরণ আমার অনায়ত্ত। তবু মনে হয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের বাণীর মহিমা সুরের ঐশ্বর্যকে ছাপিয়ে ওঠে। কখনো অবশ্য রবীন্দ্রসংগীতে কথা ও সুর যমজ বলাকার মতোই উড়ে চলে রসলোকে। (শামসুর, ১৯৯০ : ২৫৯-৬০)

শামসুর রাহমানের চৈতন্যে 'রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো গানের সৌন্দর্য হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে', যা মূলত কবির বাণীর বৈভবকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। কবি-গীতিকার-শিল্পী আবু হেনা মোস্তফা কামালের কাছেও রবীন্দ্রনাথের গানের বাণী সুর-নিরপেক্ষভাবে 'নানা ব্যঞ্জনায় অর্থবহ' হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যও তাই এ-প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য :

> শব্দের অনিবার্য সঞ্চয়ে কবিতার যে-আবেগ চেতনার উপরিতলে দোলা দেয়, গানে তা-ই মর্মের মাঝখানে অনায়াসে ঠাঁই করে নেয়। গানের সুরে আছে সেই ধ্বনি যা সহজে সহৃদয়ের কাছে নানা ব্যঞ্জনায় অর্থবহ হয়ে ওঠে বারবার। সেজন্যেই সাধারণত গানের বাণীকে সুর থেকে আলাদা করলে একটি নিষ্প্রাণ কাঠামো ছাড়া কিছুই মেলে না। বোধ করি, কেবল রবীন্দ্রনাথের গানই ব্যতিক্রম। তার যেসব গানের সুর এখনো আমার অশ্রুত, তাদের মূল্য তাই আমার কাছে কিছু মাত্র কম নয়। নিছক কবিতা হিসেবে পড়লেও যে-অন্তর্গত সুর গুনগুনিয়ে ওঠে আমার সকল চৈতন্যে, অনেক প্রসিদ্ধ সংগীতকারের সৃষ্টিতেও তেমন অনুরণন জাগে না। হয়তো সে আমার অক্ষমতা, অসামর্থ্য; কিন্তু সেইখানেই রবীন্দ্রনাথের জয়। তিনি পাষাণেও অনর্গল ফল্গুধারা বইয়ে দিতে পারেন। তার প্রত্যাশা, ব্যর্থতা, প্রতীক্ষা ও পরিণামের সাথে অভিন্ন সম্পর্কে মুহূর্তেই আমি আন্দোলিত হয়ে উঠি। এবং বারবার। এমনি তীব্র ও অব্যর্থ সেই সংগ্রাম। (আবু হেনা, ১৯৯১ : ২৪২)

সুরের আশ্রয়ে রবীন্দ্রনাথের গীত-বাণী বিশেষ মাত্রা লাভ করে শ্রোতাকে ভিন্নতর আস্বাদন উপহার দেয় সন্দেহ নেই, তবু বাণীতে ভর দিয়ে পাঠক-অন্তর অনেকটা পথ অতিক্রম করে নতুন এক পৃথিবীতে প্রবেশ করে, যেখানে শব্দের স্পর্শে চৈতন্যের স্তব্ধতা ভেঙে বিরামহীন বিস্ময়ে পাঠক নিজেকে নেড়েচেড়ে দেখার আনন্দ লাভ করেন।

'পূজা'-পর্যায়ের গানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্রষ্টা বা দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য বিচিত্র উপকরণে তাঁর অর্ঘ্য সাজিয়েছেন, কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে তাঁর নিবেদন গানের আশ্রয়েই বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছে। এই-পর্যায়ের ৬১৭টি গানের মধ্যে গান-প্রসঙ্গ নেই এমন গীত-বাণীর সংখ্যা খুব বেশি নয়। তিনি নিজের গানে তাঁর প্রাণের দেবতাকে বিশেষ করে তুলেছেন, আবার কখনো-বা দেবতার গান শুনে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এই পর্যায়ের গীত-বাণীতে স্রষ্টার সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়াটি মুখ্যত গানের ভেতর দিয়েই সম্পন্ন হয়েছে। সৃষ্টিকর্তার আশীর্বচনকে কখনো তিনি গীতসুধা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, আবার কখনো-বা তিনি ভগবানের হাতেই তুলে দিয়েছেন বিশ্ব-সংসারে প্রাণ-সঞ্চারী গানের বীণা। স্রষ্টা যেখানে শিল্পী, কবি সেখানে একজন সমর্পিত সমঝদার মাত্র। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক :

ক. তোমার সুরের ধারা ঝরে যেথায় তারি পারে
দেবে কি গো বাসা আমায় একটি ধারে?
আমি শুনব ধ্বনি কানে,
আমি ভরব ধ্বনি প্রাণে,
সেই ধ্বনিতে চিত্তবীণায় তার বাঁধিব বারে বারে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩/৬)

খ. তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী,
আমি অবাক্ হয়ে শুনি কেবল শুনি ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৪/৬)

গ. তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে,
সে আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৬/৭)

ঘ. তোমার বীণা আমার মনোমাঝে
কখনো শুনি, কখনো ভুলি, কখনো শুনি না যে ॥
আকাশ যবে শিহরি উঠে গানে
গোপন কথা কহিতে থাকে ধরার কানে কানে— (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৭/৮)

ঙ. যেমন তোমার বসন্তবায় গীতলেখা যায় লিখে
বর্ণে বর্ণে পুষ্পে পর্ণে বনে বনে দিকে দিকে
তেমনি আমার প্রাণের কেন্দ্রে নিশ্বাস দাও পুরে,
শূন্য তাহার পূর্ণ করিয়া ধন্য করুক সুরে—
বিঘ্ন তাহার পুণ্য করুক তব দক্ষিণপাণি ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৯/৯)

চ. গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে
রুদ্ধবাণীর অন্ধকারে কাঁদন জেগে উঠে ॥
বিশ্বকবির চিত্তমাঝে ভুবনবীণা যেথায় বাজে
জীবন তোমার সুরের ধারায় পড়ুক সেথায় লুটে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১০/৯)

ছ. গানের লীলার সেই কিনারে যোগ দিতে কি সবাই পারে
বিশ্বহৃদয়পারাবারে রাগরাগিণীর জাল ফেলাতে —
তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১২/১০)

উদ্ধৃতি ক-এ স্রষ্টার সুরের সান্নিধ্য লাভের জন্য রবীন্দ্রনাথের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। এই সুর কবির কানে ও প্রাণে যে প্রণোদনা জাগিয়েছে তাকে তাঁর চিত্তের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করার পক্ষপাতি তিনি। তাই কবির নিভৃত প্রহরে এই সুর 'ফুলের ভিতর মধুর মতো' মনে হয় এবং প্রত্যাশা করেন, 'আমার দিন ফুরাবে যবে,/যখন রাত্রি আঁধার হবে,/হৃদয়ে মোর গানের তারা ফুটে সারে সারে ॥' খ-সংখ্যক উদ্ধৃতিতে বিশ্বস্রষ্টার গানে কবির মুগ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে। এই গানেও আমরা স্রষ্টার সুরে পুরো পৃথিবী প্লাবিত হতে দেখি। এই গান পাষাণেরও বক্ষ ভেদ করার ক্ষমতা রাখে। তিনি নিজে যখন এই সুরে গান গাইতে চান, তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করেন কবিকণ্ঠে সেই সুর কিছুতেই ধরা দেয় না। তাই চতুর্দিকে সুরের জালে ভগবান যে ফাঁদ পেতেছেন, সেখানে ধরা পড়ার আনন্দ কান্নার মতো সুন্দর হয়ে ওঠে। ৬-সংখ্যক গানে আমরা লক্ষ করি স্রষ্টার সুরের আগুন কেবল কবির অন্তরেই নয়, সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এই সুরে মরা গাছের ডালে ডালে প্রাণের স্পর্শ লেগেছে, তাই সে আকাশের দিকে হাত বাড়ানোর স্পর্ধা দেখায়। এই সুরে অন্ধকারের তারায় তারায় বিস্ময়ের ছোঁয়া লাগে, কোনো এক অচেনা প্রান্ত থেকে ছুটে আসে পাগল হাওয়া, এই সুর পরশ-পাথর হয়ে অন্ধকারের বুকে স্বর্ণকমল ফোটায়। কবি অবাক হয়ে ভাবেন, 'আগুনের কী গুণ আছে কে জানে'। অন্য একটি গানে রবীন্দ্রনাথ এই আগুনের মহিমাকীর্তন করেছেন। আগুনকে ভাই সম্বোধন করে তার জয়গান গেয়েছেন কবি। আগুনকে কবি মুক্তির দূত হিসেবে সম্মানিত করেছেন : 'ওরে আগুন আমার ভাই/আমি তোমারই জয় গাই।/তোমার এই শিকল-ভাঙা এমন রাঙা মূর্তি দেখি নাই ॥/তুমি দু হাত তুলে আকাশ-পানে মেতেছ আজ কিসের গানে,/একি আনন্দময় নিত্য অভয় বলিহারি যাই ॥' (৬১১/২৪০)। বিশ্ববীণার সুরে যে

শৈল্পিক অস্পষ্টতা আছে, তারই প্রকাশ লক্ষ করি ঘ-সংখ্যক গানে। কবি বলেন, 'তোমার সুর ফাগুনরাতে জাগে,/তোমার সুর অশোকশাখে অরুণরেণুরাগে।/সে সুর বাহি চলিতে চাহি আপন-ভোলা মনে/গুঞ্জরিত-ত্বরিত-পাখা মধুকরের সনে।' কুহেলী-জড়ানো এই গানের মর্মে প্রবেশ করতে না-পারার লজ্জায় বিচলিত কবিচিত্ত এই গীত-বাণীতে চারুকৃত। ঙ-সংখ্যক গানে অরূপের বাণী কবির চিত্তে মুক্তির আনন্দ ছড়িয়ে দেবে— এই প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে। একই উপলব্ধির প্রকাশ লক্ষ করি চ-সংখ্যক গানে যেখানে বন্ধনমুক্তির বাসনা আরো তীব্র ও তাৎপর্যপূর্ণ। কবি অনুভব করেন, এই বন্ধনমুক্তির গানে ছন্দপতন ঘটলেই তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন, অন্তর ও বাহিরের তানে ব্যবধান রচিত হয়— 'সুরহারা প্রাণ বিষম বাধা— সেই তো আঁধি সেই তো ধাঁধা—/গান-ভোলা তুই গান ফিরে নে, যাক সে আপদ টুটে'। নীলা গোস্বামী এই গীত-বাণী সম্পর্কে বলেন : 'বিশ্বসুরের সঙ্গে ব্যক্তি সুরের যেখানেই অমিল সেখানেই যত দ্বন্দ্ব, যত বিঘ্ন বিপত্তি, যত অশুভ অমঙ্গল অপূর্ণতা, আর যেখানে মিল, সেখানেই শিব, সুন্দর ও পূর্ণতা।' (নীলা, ২০০৫ : ২০৩)। ছ-সংখ্যক গানে দেখছি, কবি সাঁঝ বেলায় বসে স্রষ্টার সুরে সুর মেলানোর চেষ্টা করছেন। ভগবানের একতারার একটি তার কিছুতেই সেই গানের বেদনা সহ্য করতে পারছে না। স্রষ্টার সঙ্গে সুরের খেলায় তিনি পরাজয় স্বীকার করলেও এই গানের লীলায় যোগ দেয়ার জন্য নিজেকে যোগ্য করে তুলতে চান কবি। এভাবেই স্রষ্টার গান নানা রূপে-রসে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টিকে আলোড়িত করে এবং এই আলোড়ন তাঁর গীত-বাণীর পাঠককেও আন্দোলিত-উদ্দীপিত করে।

সৃষ্টিকর্তার কাছে গানের দীক্ষা নিয়ে নিজের সৃজনপ্রতিভাকে সপ্রতিভ করার প্রার্থনাও রবীন্দ্রনাথের গীত-বাণীর বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে। যে গুণীর গান কবি অবাক হয়ে শোনেন, তারই তানে নিজের তার বেঁধে নিতে চেয়েছেন কবি। নিজের বিত্ত-বৈভব ও বাণীকে ভগবানের কাছে গচ্ছিত রেখে তাঁর সুরে সুর মেলানোর ইচ্ছে প্রকাশ পেয়েছে অনেক গীত-বাণীতে। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'গানটি তোমার চলে এলো আকাশে/আজ ফাগুন-দিনের বাতাসে/ওগো, আমার নামটি তোমার সুরে সুরে কেমন করে দিলে জুড়ে/লুকিয়ে তুমি ওই গানেরই আড়ালে/আজ ফাগুন-দিনের সকালে ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৪৩/২৪) — তখন স্রষ্টার সুরের কাছে সমর্পণের ছবিটি স্পষ্ট হয়ে যায়। বিশ্বস্রষ্টার ইচ্ছের অনুকূলে নিজেকে নির্মাণ করার এই ব্যাকুলতায় কবির সংগীতসাধনা নতুন মাত্রা লাভ করেছে। গুরুর প্রতি শিষ্যের যে আনুগত্য, বেশ কিছু গানের বাণীতে আমরা তারই বর্ণিল প্রকাশ লক্ষ করি। স্রষ্টার সুরে সুর মিলিয়ে গান গাওয়ার মাধ্যমে ভগবানের ভক্ত হিসেবে তাঁর একনিষ্ঠার পরিচয় মেলে : 'ওগো, সেদিন তুমি গাইতে যে-সব গান/কোনো অর্থ তাহার কে জানত।/শুধু সঙ্গে তারি গাইত আমার প্রাণ,/সদা নাচত হৃদয় অশান্ত।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৬৪/৩২)। এই অশান্ত হৃদয়ের বিহ্বলতাকে হয়তো দূরের সুরকে অন্তরে ধারণ করার স্মারক হিসেবে গ্রহণ করা যায়। আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করি :

ক. সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা —
মোরা সুরের কাঙাল, এই আমাদের ভিক্ষা ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২/৫)

খ. গানের ঝরনাতলায় তুমি সাঁঝের বেলায় এলে।
দাও আমারে সোনার-বরণ সুরের ধারা ঢেলে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩০/১৭)

গ. প্রভু, তোমার বীণা যেমনি বাজে
আঁধার-মাঝে
অমনি ফোটে তারা।
যেন সেই বীণাটি গভীর তানে
আমার প্রাণে
বাজে তেমনিধারা ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩৫/১৯)

ঘ. তুমি একলা ঘরে বসে বসে কী সুর বাজালে
প্রভু, আমার জীবনে!
তোমার পরশরতন গেঁথে গেঁথে আমায় সাজালে
প্রভু, গভীর গোপনে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩৬/২০)

ঙ. তোমার সুর শুনিয়ে যে ঘুম ভাঙাও সে ঘুম আমার রমণীয় —
জাগরণের সঙ্গিনী সে, তারে তোমার পরশ দিয়ো ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩৮/২১)

চ. গোপন রহি গভীর প্রাণে আমার দুঃখসুখের গানে
সুর দিয়েছ তুমি, আমি তোমার গান তো গাই নি ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৫০/২৬)

ছ. সীমার মাঝে অসীম তুমি, বাজাও আপন সুর —
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৬৫/৩২-৩৩)

জ. আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র তব বাণী।
তারি সাথে প্রভু, মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি — (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৮৫/৪০)

ঝ. শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে
তোমারি সুরটি আমার মুখের 'পরে, বুকের 'পরে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৯৮/৪৫)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহে আমরা লক্ষ করি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভগবান বা জীবনদেবতার পায়ের কাছে বসে গানের দীক্ষা নেয়ার কথা বলেছেন। 'জীবনে আমার সঙ্গীত দাও আনি,/নীরব রেখো না তোমার বীণার বাণী — প্রিয়তম হে, জাগো জাগো জাগো ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩৯/২২) — এই গীত-বাণীতে কবির প্রিয়তম জেগে উঠবে কি-না সে বিষয়ে নিশ্চিত না হয়েও বলা যায়, কবির জাগ্রত সত্তায় শিল্পের সারস্বত অভিব্যক্তি বিশেষ মাত্রা লাভ করে। কবির এই সংগীতের সাধনা সীমার মাঝে বসে অসীমেরই সাধনা। তাই বারবার তাঁর নিজের গানের বাণী-বিন্যাসে তিনি বিচলিত চিত্তের কথা বলেন, সুর সংযোজনেও বিক্ষুব্ধ মানসতার দীনতা স্বীকার করে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন। 'হেথা যে গান গাইতে আসা, আমার হয় নি সে গান গাওয়া—/আজও কেবলই সুর সাধা, আমার কেবল গাইতে চাওয়া ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২২/১৪)। কিংবা 'আমি হেথায় থাকি শুধু গাইতে তোমার গান,/দিয়ো তোমার জগৎ-সভায় এইটুকু মোর স্থান ॥/আমি তোমার ভুবন-মাঝে লাগি নি, নাথ কোন কাজে — /শুধু কেবল সুরে বাজে অকাজের এই প্রাণ ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২৩/১৪) — এই আকুতির মধ্যেই প্রকৃত গানের সন্ধানে তাঁর নিঃশর্ত সমর্পণের চিহ্ন স্পষ্ট। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই প্রকৃত গান পরম প্রভুর প্রাণের কথায় পূর্ণ, যা কবির শূন্য হৃদয়কে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের উপযোগী করে তুলবে।

রবীন্দ্রনাথের গানে সৃষ্টিকর্তাও সুন্দরের রূপকল্পে নির্মিত হয়েছে। কবির অন্তর গানের আড়ালে দাঁড়িয়ে এই সুন্দরকে পরম ভেবে প্রণতি জানিয়েছে। বাংলা ভাবসঙ্গীতের ঐতিহাসিক পরম্পরাকে স্বীকরণ করেই কবির এই গীত-বাণী স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। শিল্পসমালোচক অনুপ ঘোষাল যথার্থই বলেছেন : 'কবির সমস্ত জীবনের বিপুল সৌন্দর্যের অনুভূতি একীভূত হয়ে এক একটি গানে এমন অভিনব বৈচিত্র্যে আত্মপ্রকাশ করেছে যার তুলনা বাংলা গানের জগতে পাওয়া দুঃসাধ্য।' (অনুপ, ১৪০৮ : ১৩২)। স্রষ্টার সৌন্দর্য ও গানের সৌন্দর্যের যুগল যাত্রায় তাঁর গানের বাণী পাঠকের চৈতন্যের নানা প্রান্তে আলোক সঞ্চার করে। চৈতন্যের গভীরতলস্পর্শী এইসব গানের বাণীতে কবির অধ্যাত্মসাধনার সারাৎসার শৈল্পিক অবয়ব লাভ করেছে। সৌন্দর্যের প্রচলিত ধারণা পাল্টে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ আবেগ-কল্পনা-অনুভূতির সংশ্লেষণে অভিনব ও অনাস্বাদিত এক সুন্দরের সঙ্গে পাঠককে পরিচয় করিয়ে দেন। প্রসঙ্গত একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করি :

গান তখনই সুন্দরের বার্তাবহ হয়ে ওঠে যখন সে দ্বন্দ্ববিরোধের অবসান ঘটায়। সুন্দর কী? অবনীন্দ্রনাথ সাত রকম সুন্দরের কথা বলেছেন। যার মধ্যে (১) সুখদ বলেই সুন্দর (২) অপরিমিত বলেই সুন্দর (৩) সুশৃঙ্খল বলেই সুন্দর (৪) সুসংহত বলেই সুন্দর — এই চতুরঙ্গ সুন্দর-ভাবনাকে গানের প্রসঙ্গে ভাবা যায়। অন্যদিকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেন, 'যেখানে আনন্দ পাওয়া যায় তাহাই সুন্দর এবং যেখানে বিনা কারণে আনন্দ পাওয়া যায় তাহা সেইজন্যই অতি সুন্দর'। শিল্প প্রসঙ্গে উক্ত হলেও, গান প্রসঙ্গে এই মন্তব্য মেনে নিতে আপত্তির কিছু নেই। গান তো অকারণ অবারণ চলার, ভাবার সঙ্গী। আবেগ কল্পনা ও অনুভূতির রসায়নে গান হয়ে ওঠে সুন্দর। যে সুন্দর নিঃশর্ত, নিঃস্বার্থ, আনন্দময় এবং রসময়। (তরুণ, ২০০৬ : ৮৭)

রবীন্দ্রনাথের গানে সুন্দর স্রষ্টার প্রতিনিধিত্ব করেছে। তাই নিজের যা-কিছু সুমহান, যা-কিছু সুন্দর তার সবকিছুকেই কবি স্রষ্টার গানের সুরে স্নান করিয়ে নিতে চান : 'হে বন্ধু মোর, হে অন্তরতর, এ জীবনে যা-কিছু সুন্দর/সকলই আজ বেজে উঠুক সুরে/প্রভু, তোমার গানে, তোমার গানে, তোমার গানে ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৯৪/৪৪) — এই গীত-বাণীতে কবির সুন্দর প্রভুর গানের আনুগত্য করেছে। বিশ্ববীণার বিপুল সুরে প্রভুর সঙ্গে তাঁর দূরত্ব গেছে ঘুচে, তাই প্রভুকে তিনি সম্বোধন করেন বন্ধু ও অন্তরতর হিসেবে। এ-প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের বক্তব্যের শরণ নেয়া যাক :

> সৌন্দর্যের আসল প্রকৃতিকে তার অঙ্গসংস্থানের উৎস থেকে সন্ধান করতে গিয়ে এই কথাই আমরা বুঝতে চাই যে ধ্বনিগত রূপের সঙ্গে বুদ্ধিগত উপাদানের ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। সংগীতে 'রূপ' কথাটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। ধ্বনি যে রূপ সৃষ্টি করে তা শূন্যগর্ভ নয়, শূন্য একটা স্থানকে ঘিরে রাখা কোন আবরণ বিশেষ নয়, তা সৃজনশীল প্রতিভার জীবন্ত সৃষ্টির দ্বারা পরিপূর্ণ একটি রূপ। (সাধন, ২০০২ : ৫৫)

রবীন্দ্রনাথের গানের বাণীতে সুন্দরকে শিল্পঋদ্ধ করার যে প্রয়াস লক্ষ করা যায়, সেই সুন্দর প্রতিদিনের সমুদয় সৌন্দর্য স্বীকরণ করলেও প্রকৃত প্রস্তাবে পরম সুন্দরের দিকেই তাঁর পক্ষপাত। "জাগ' জাগ' রে জাগ' সংগীত — চিত্ত অম্বর কর তরঙ্গিত/নিবিড়নন্দিত

প্রেমকম্পিত হৃদয়কুঞ্জবিতানে ॥" (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২১/১৪) — এই বাণীতে চিত্তের যে বিশুদ্ধতা কবির প্রত্যাশিত, তা পরম স্রষ্টার আপন হাতের বীণায় ঝঙ্কৃত হলেই তা নিবিড়নন্দনের সঙ্গে অন্তরের মেলবন্ধন রচনা করে। বিবিধ বিচ্যুতি সত্ত্বেও গানের টানেই মন হারিয়ে যায় কবির, সৃষ্টির আনন্দ থেকে ছুটি নেয়ার কথা তাই ভাবা যায় না : 'দাও না ছুটি, ধর ত্রুটি, নেই নে কানে।/মন ভেসে যায় গানে গানে।/আজ যে কুসুম-ফোটার বেলা, আকাশে আজ রঙের মেলা,/সকল দিকেই আমায় টানে গানে গানে ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১৮/১৩)। এই গানের টানই কবির প্রাণের ছোঁয়ায় নতুন গান হয়ে ওঠে। এই গান তাঁর পরম সুন্দরের সান্নিধ্যে সার্থকতা লাভ করলেও তৃপ্তি পান না কবি, মনে হয় যাঁর জন্য এই গান, তা তাঁর গন্তব্যে পৌঁছে গেলেও তিনি যেন পথের ধারের সেই একলা পথিক, যাঁর গতিপথ কুসুমাস্তীর্ণ নয় : 'দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে—/আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাই নে তোমারে ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১৯/১৩)। রবীন্দ্রনাথের গানের সুর তাঁর দেবতার চরণ ছুঁয়ে সার্থকতা লাভ করলেও জীবনের বিচিত্র আঘাত-অসম্মান-অপব্যয়ে দেবতার সুরই তাঁর বেঁচে থাকার অন্যতম অবলম্বন। তাই স্রষ্টার অনিচ্ছা বা উপেক্ষাকেও আশীর্বাদ ভেবে তাঁরই গলায় বরণমালা পরাতে চান কবি : 'অপমানের পথের মাঝে তোমার বীণা নিত্য বাজে/আপন-সুরে-আপনি-নিমগন।/ইচ্ছা ছিল বরণমালা পরাই তোমার গলে,/নাই-বা তোমার থাকল প্রয়োজন ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৫৯/৩০)। জীবনদেবতার সান্নিধ্য না-পাওয়ার আক্ষেপ কবির পাওয়ার ইচ্ছেকে যেমন তীব্রতর করেছে, তেমনি তাঁর চাওয়াতেও যুক্ত করেছে সমর্পিত চিত্তের সবটুকু সৌরভ ও সমৃদ্ধি। তাই কবির ব্যক্তিগত বীণাকে নিজের ইচ্ছের অনুকূলে বাজাতে গিয়ে তিনি অবাক হয়ে লক্ষ করেছেন, বীণা তাঁর হাতে, কিন্তু সেই বীণা হতে সেই পরম স্রষ্টারই বিচিত্র সুর ধ্বনিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের গীত-বাণীতে তাঁর জীবনদেবতা কিংবা পরম-প্রিয়জন কীভাবে বিচিত্র অবয়বে উপস্থিত হয়েছে তার আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক :

ক. গানের সুরের আসনখানি পাতি পথের ধারে।
ওগো পথিক, তুমি এসে বসবে বারে বারে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২৪/১৫)

খ. খেলার ছলে সাজিয়ে আমার গানের বাণী
দিনে দিনে ভাসাই দিনের তরীখানি ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২৭/১৬)

গ. যখন তুমি আমায় বসিয়ে রাখ বাহির-বাটে
তখন গানের পরে গান গেয়ে মোর প্রহর কাটে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২৮/১৬)

ঘ. আমার যে গান তোমার পরশ পাবে
থাকে কোথায় গহন মনের ভাবে?। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২৯/১৭)

ঙ. কণ্ঠে নিলেম গান, আমার শেষ পারানির কড়ি–
একলা ঘাটে রইব না গো পড়ি ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩১/১৭)

চ. আমার ঢালা গানের ধারা সেই তো তুমি পিয়েছিলে,
আমার গাঁথা স্বপন-মালা কখন চেয়ে নিয়েছিলে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩২/১৮)

ছ. তুমি খুশি থাক আমার পানে চেয়ে চেয়ে
তোমার আঙিনাতে বেড়াই যখন গেয়ে গেয়ে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৬১/৩১)

জ. জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়, গীতসুধারসে এসো ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৯৫/৪৪)

ঝ. গাব তোমার সুরে দাও সে বীণাযন্ত্র,
শুনব তোমার বাণী দাও সে অমর মন্ত্র। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৯৭/৪৫)

রবীন্দ্রনাথ পথের ধুলোয় জীবনের পাথেয় সংগ্রহের সাধনা করেছেন, অচেনাকে চিনে নেয়ার ব্যাকুলতায় সবার মুখের দিকে তাকিয়েছেন তিনি। পথিককে প্রাণের মানুষ হিসেবে গ্রহণ করেই তিনি গেয়ে উঠেছেন : 'পান্থ তুমি পান্থজনের সখা হে,/পথে চলাই সেই তো তোমার পাওয়া।/যাত্রাপথের আনন্দগান যে গাহে/তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৫৬৪/২২২)। চলার আনন্দকে গানের ছন্দে বেঁধে নিয়ে কবির পথিক-হৃদয় নির্ভয়ে গন্তব্যের দিকে অগ্রসর হয়েছে। এই গতিশীলতার মধ্যেই ইতিবাচক জীবনার্থ অন্বেষণের প্রয়াস পেয়েছেন কবি। জীবনে স্তব্ধতা এলে আলোর প্রবেশপথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তাই তিনি অবিরাম চলার আনন্দে অবগাহন করে নিজের সজীবতা ও সক্রিয়তার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর গীত-বাণীতে তাই পথ ও পথিকের অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে বারবার। নিজের অসম্পূর্ণ চিত্তের অস্থিরতাকে তিনি গীত-বাণীর আশ্রয়ে পূর্ণতা দিতে চেয়েছেন। তাই তাঁর এই ঘর ছেড়ে বাইরে আসা, পথের সঙ্গে 'বন্ধনহীন গ্রন্থি' রচনা করা। পথে এসেই তিনি পথিকের কলরবকে পরম ছান্দসিক বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে সমীকৃত করার প্রয়াস পেয়েছেন : 'প্রভাতের পথিক সবে/এল কি কলরবে—/গেল কি গান গেয়ে ওই সারে সারে!/বুঝি-বা ফুল ফুটেছে, সুর উঠেছে অরুণবীণার তারে তারে ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৫৮/৩০)। পথ চলতে চলতে যখনি ক্লান্তি এসে কবিকে আঁকড়ে ধরেছে, তখনি তিনি পথের অর্জনকে নতুন ছন্দে ধারণ করার প্রয়াস পেয়েছেন, নিজের উদ্দেশ্যেই তিনি গেয়ে উঠেছেন : 'শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ, পথ-প্রান্তে এ কী খেলা!/আজি বহে অমৃতসমীরণ, চলো চলো এই বেলা ॥/তাঁর দ্বারে হেরো ত্রিভুবন দাঁড়ায়ে,/সেথা অনন্ত উৎসব জাগে,/সকল শোভা গন্ধ সঙ্গীত আনন্দের মেলা ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৪৫৭/১৮১)। তাঁর গীত-বাণীতে গতির ভেতর দিয়ে জীবনের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছানোর কথা বলেন তিনি। পথে নেমে প্রাণ খুলে গান গাওয়ার মাধ্যমে প্রতিদিনের ব্যবহৃত বিশ্বের সঙ্গে চিত্তের বৈচিত্র্যহীন বন্ধন যেমন ঘুচে যায়, তেমনি মুছে যায় মনের কালিমা। আরো কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপন করি :

ক. কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে —
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩৩/১৮)

খ. ক্ষণে ক্ষণে আমি না জেনে করেছি দান
তোমায় আমার গান। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৫৬/২৮-২৯)

গ. পাগল-করা গানের তানে ধায় যে কোথা কেই বা জানে,
চায় না ফিরে পিছন-পানে, রয় না বাঁধা বন্ধে রে—
লুটে যাবার, ছুটে যাবার, চলবারই আনন্দে রে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩১৫/১৩৩)

ঘ. প্রতি দিনের কাজের পথে করতে আনাগোনা
কানে আমার লেগেছে গান, করেছে আন্‌মনা। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩৪৪/১৪৩)

ঙ. যায় চলে ওই অশ্রু-ভরা কোন্ গানে
আসা-যাওয়ার মাঝখানে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩৮৭/১৬০)

চ. পথে চলে যেতে যেতে কোথা কোন্‌খানে
তোমার পরশ আসে কখন কে জানে ॥
কী অচেনা কুসুমের গন্ধে, কী গোপন আপন আনন্দে,
কোন্ পথিকের কোন্ গানে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৫৭২/২২৫)

ছ. ধুলা-ওড়া হাওয়ার ডাকে পথ যে টেনে লয় আমাকে—
নতুন নতুন বাঁকে বাঁকে গান দিয়ে যাই ধরিত্রীকে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৫৭৫/২২৬)

জ. আকাশ ভরে দূরের গানে,
অলখ দেশে হৃদয় টানে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৫৭৭/২২৭)

রবীন্দ্রনাথের পথ তাঁর কণ্ঠে গান জুগিয়েছে। পথে নামলেই পথের দেখা পাওয়া সম্ভব এবং পথচলার রীতিপদ্ধতিও অনায়ত্ত থাকে না। তাঁর মতে, চলমানতাই জীবনের সজীবতাকে স্বাগত জানায়। তিনি চলার পথে পথিকের সংযমের আবশ্যকতা স্বীকার করলেও অসংযমের বেগকে উপেক্ষা করেন নি। রবীন্দ্রনাথ *কালান্তর* গ্রন্থের 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' প্রবন্ধে বলেছেন :

> চলার পদ্ধতির মধ্যে অবিবেচনার বেগও দরকার, বিবেচনার সংযমও আবশ্যক; কিন্তু অবিবেচনার বেগও বন্ধ করিব আবার বিবেচনাও করিতে পারিব না — মানুষকে বলিব, তুমি শক্তিও চালাইয়ো না, বুদ্ধিও চালাইয়ো না, কেবলমাত্র ঘানি চালাও, এ বিধান কখনোই চিরদিন চলিবে না। যে পথে চলাফেরা বন্ধ, সে পথে ঘাস জন্মায় এবং ঘাসের মধ্যে নানারকম ফুলও ফোটে। সে ঘাস সে ফুল সুন্দর এ কথা কেহই অস্বীকার করিবে না কিন্তু পথের সৌন্দর্য ঘাসেও নহে, ফুলেও নহে, তাহা বাধাহীন বিচ্ছেদহীন বিস্তারে; তাহা ভ্রমরগুঞ্জনে নহে কিন্তু পথিকদলের অক্লান্ত পদধ্বনিতেই রমণীয়। (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ১২/৫৭৭)

কবির গীত-বাণীতে যে পথের দেখা মেলে তা পথিকের পদচারণায় প্রাণবন্ত। তবু তাঁর বাণীতে পথের ঘাস, ফুলের সৌন্দর্য ও ভ্রমরের গুঞ্জনকে বিশেষ মূল্য দেয়া হয়েছে। কারণ অবরুদ্ধ পথও কারও পায়ের স্পর্শের অপেক্ষায় থাকে। পথের এইসব উপকরণও পথিকের দৃষ্টিকে বাইরে টেনে আনে। বিচ্ছেদের আঘাত তাঁর মিলনের আকাঙ্ক্ষাকে সচেতন করে তোলে বলেই তিনি পথিকের উদ্দেশ্যে গেয়ে ওঠেন : 'ওরে পথিক, ওরে প্রেমিক,/বিচ্ছেদে তোর খণ্ড মিলন পূর্ণ হবে।/আয় রে সবে/প্রলয়গানের মহোৎসবে ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৫৭৮/২২৭)। বিচ্ছেদ ও মিলনের এই অন্তরঙ্গ অবলোকনে তাঁর গীত-বাণী 'প্রলয়গানের মহোৎসবে' পরিণত হলেও কবির পথিক পরান মিলনের মন্ত্রোচ্চারণেই অধিকতর আরাম বোধ করেছে। বলা যায়, পথের শেষে মিলনের প্রতিশ্রুতিই পথিকের বিচ্ছেদযাপনকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে।

'আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ' — রবীন্দ্রনাথের এই গানে পথপানে চেয়ে পথিকের আসা-যাওয়া উপভোগের কথা বলা হলেও তাঁর গানের পাঠক-শ্রোতা হিসেবে আমরা জানি, পথ-চলার আনন্দই তাঁর গীত-বাণীতে অধিকতর উজ্জ্বল, প্রবল এবং

প্রাণবন্ত। কিন্তু পথিক তো কেবল হেঁটেই চলেন না, কখনো ক্লান্তি দূর করার জন্য, কখনো-বা পথের ধারের সৌন্দর্য উপভোগের অভিপ্রায়ে পথের ধারে তাঁকে বসতেও হয়। এই বসে থাকাকেও বীণার ঝংকারে বিশেষ তাৎপর্য দিয়েছেন তিনি। পথের ধারে বসে কবি কখনো নিজের হাতে ভগবানের বাঁশি বাজিয়েছেন, বীণার বৈভবে নিজেকে প্রাণিত ও শাণিত করেছেন, কখনো-বা ভগবানের হাতেই তুলে দিয়েছেন তাঁর প্রাণের বীণা। স্রষ্টার সুরের তালে পা ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন তিনি। 'বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি সেকি সহজ গান!/সেই সুরেতে জাগব আমি, দাও মোরে সেই কান ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২২২/৯৮) — এই গীত-বাণীতে কবির প্রভু বা প্রিয়জন নিজেই বজ্রের বাঁশিতে ভক্ত-হৃদয়কে জাগিয়ে তুলেছেন। আবার 'হার-মানা হার পরাব তোমার গলে/দূরে রব কত আপন বলের ছলে ॥/জানি আমি জানি ভেসে যাবে অভিমান—/নিবিড় ব্যথায় ফাটিয়া পড়িবে প্রাণ,/শূন্য হিয়ার বাঁশিতে বাজিবে গান,/পাষাণ তখন গলিবে নয়নজলে ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২৪৭/১০৮) — এই গানে আমরা লক্ষ করি, কবি প্রত্যাশা করছেন, বীণায় যে সুর জেগেছে, তাতে ভগবানের পাষাণ-হৃদয়েও করুণার সঞ্চার হবে। আবার কোনো-কোনো গানে লক্ষ করি, কবির বীণা ও স্রষ্টার বীণার সুর একাকার হয়ে গেছে, এই দুইয়ের মাঝখানে বিশেষ কোনো ভেদরেখা স্বীকার করছেন না তিনি : 'এখন সে যে আমার বীণা, হতেছে তার বাঁধা,/বাজবে যখন তোমার হবে তোমার সুরে সাধা—/সব দিতে হবে॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৪৮২/১৯১)। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সকল সৃষ্টিতেই নিজের সবটুকু ঢেলে দিয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু গান রচনায় নিরাভরণ পক্ষপাত দেখিয়েছেন তিনি। এই পক্ষপাতের প্রমাণ হিসেবে তাঁর রচনার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি :

> আমি যখন গান বাঁধি তখনি সব চেয়ে আনন্দ পাই। মন বলে — প্রবন্ধ লিখি, বক্তৃতা দিই, কর্তব্য করি, এ-সবই এর কাছে তুচ্ছ। আমি একবার লিখেছিলাম—
>
> যবে কাজ করি,
> প্রভু দেয় মোরে মান।
> যবে গান করি,
> ভালোবাসে ভগবান।
>
> এ কথা বলি কেন? — এইজন্যে যে, গানে যে আলো মনের মধ্যে বিছিয়ে যায় তার মধ্যে আছে এই দিব্যবোধ যে, যা পাবার নয় তাকেই পেলাম আপন ক'রে নতুন ক'রে। এই বোধ যে, জীবনের হাজারো অবান্তর সংঘর্ষ হানাহানি তর্কাতর্কি এ-সব এর তুলনায় বাহ্য — এই'ই হল সারবস্তু — কেননা, এ হল আনন্দলোকের বস্তু, যে লোক জৈবলীলার আদিম উৎস। প্রকাশলীলায় গান কি না সব চেয়ে সূক্ষ্ম — ethereal— তাই তো সে অপরের স্বীকৃতির স্থূলতার অপেক্ষা রাখে না। (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ১৬/৫৮১-৮২)

গানের ভেতর দিয়ে ভগবানের ভালোবাসা লাভ করার প্রলোভনেই তিনি নিজ হাতে বীণা তুলে নিয়েছেন, বিষয়টি নিশ্চয়ই এমন নয়; গান তাঁর চৈতন্যে যে আনন্দলোকের আবহ রচনা করে তারই প্রকাশ কখনো গান-অনুষঙ্গে, কখনো বাঁশি কিংবা বীণা প্রসঙ্গে ব্যক্ত করেছেন কবি। কবি তাঁর দেহকে বীণার রূপকল্পে বিবেচনা করেছেন, আর সেই বীণার সুর হয়ে উঠেছে স্রষ্টার বাণী। দেবতার হাতের স্পর্শে নিজেকে বাজানোর ব্যাকুল বাসনাই যেন তাঁর গান, তাই তা পাঠক-শ্রোতার ব্যক্তিগত বীণায় বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে :

ক. শুধু কি তার বেঁধেই তোর কাজ ফুরাবে
গুণী মোর, ও গুণী!
বাঁধা বীণা রইবে পড়ে এমনিভাবে
গুণী মোর, ও গুণী ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৮৬/৪০)

খ. যদি কোনো দিন এ বীণার তারে তব প্রিয়নাম নাহি ঝঙ্কারে
দয়া ক'রে তবু রহিয়ো দাঁড়ায়ে, ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১০২/৪৭)

গ. যখন তুমি বাঁধছিলে তার সে যে বিষম ব্যথা—
বাজাও বীণা, ভুলাও ভুলাও সকল দুখের কথা ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২০৯/৯৩)

ঘ. থাক্ তবে সেই কেবল খেলা, হোক-না এখন প্রাণের মেলা—
তারের বীণা ভাঙল, হৃদয়-বীণায় গাহি রে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২৫৩/১১০)

ঙ. তোমার যজ্ঞে দিয়েছ ভার বাঁজাই আমি বাঁশি—
গানে গানে গেঁথে বেড়াই প্রাণের কান্না হাসি । (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩১৭/১৩৪)

চ. অরূপ বীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে,
সে বীণা আজি উঠিল বাজি হৃদয় মাঝে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩৪৭/১৪৪)

ছ. তাকায়ে রব দ্বারের পানে, সে তানখানি লইয়া কানে
বাজায়ে বীণা বেড়াব গান গাহি রে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩৬০/১৫০)

জ. দিনরজনীর বাঁশি পুরে যে গান বাজে অসীম সুরে
তারে আমার প্রাণের তারে বাজানো চাই
আপন গান যে দূরে তাহার, নিয়ড়ে নাই ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩৮৪/১৫৯)

ঝ. গাও বীণা— গাও বীণা, গাও রে।
অমৃতমধুর তাঁর প্রেমগান মানব-সবে শুনাও রে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৪৫৮/১৮১)

ঞ. চিরদিনের সুরটি বেঁধে শেষ গানে তাঁর কান্না কেঁদে
নীরব যিনি তাঁহার পায়ে নীরব বীণা দিব ধরি ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৬০৭/২৩৮)

ট. দিনের বেলায় বাঁশি তোমার বাজিয়েছিলে অনেক সুরে—
গানের পরশ প্রাণে এল, আপনি তুমি রইলে দূরে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৬০৩/২৩৭)

সীমা ও অসীমের যুগল স্রোতকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীত-বাণীতে নানা রূপকল্পে ধারণ করেছেন। সীমার প্রদীপ থেকে যখন অসীমের আলো নির্গত হয়েছে, তখনই তাঁর কাছে সত্যের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। প্রসঙ্গত স্মরণ করি তাঁর *সাহিত্যের পথে* গ্রন্থের 'সৃষ্টি' শীর্ষক প্রবন্ধের অংশবিশেষ : 'রূপের সীমা আছে। কিন্তু রূপ যখন সেই সীমামাত্রকে দেখায় তখন সত্যকে দেখায় না। তার সীমাই যখন প্রদীপের মতো অসীমের আলো জ্বালিয়ে ধরে তখনই সত্য প্রকাশ পায়।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ১২/৪৬৮-৬৯)। একই অনুভবের প্রকাশ লক্ষ করি 'পূজা'-পর্যায়ের ৬৫-সংখ্যক গীত-বাণীতে। কবির স্রষ্টা এখানে সীমার আবরণে অসীমের বিস্ময় সঞ্চার করেছে। কবির অধরা ঈশ্বর এখানে নানা বর্ণে নানা গন্ধে তাঁর উপস্থিতি ঘোষণা করলেও সেই ঘোষণাপত্র গানের ছন্দে ভর দিয়েই পাঠক-শ্রোতার অন্তঃকরণকে আলোড়িত করেছে। বিশ্বস্রষ্টার হাতে যে বীণা তা সাধারণ উপাদানে নির্মিত নয়, তা কবির চৈতন্যে আগুনের পরশমণি ছুঁইয়ে দেয়। সেই বাঁশির সুরে কবির অন্তরই কেবল কেঁপে ওঠে না, এই ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর মধ্যেই তিনি কম্পন ও শিহরন

ছড়িয়ে দেন। তাই তিনি গেয়ে ওঠেন : 'অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন ক'রে!/আকাশ কাঁপে তারার আলোর গানের ঘোরে ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১৫৮/৭৩) এই গানের ঘোরেই প্রাণের প্রকাশ এমন সরল-সবল-স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর গানের কথারা আড়ালে দাঁড়িয়ে সুরের সম্মোহনকে সাধুবাদ জানালেও অসাধু সুরব্যবসায়ীর হাতে তাঁর বাণীর নাজেহাল হওয়াকে তিনি কখনোই প্রশ্রয় দেন নি। তাঁর মতে, সংগীতের সঙ্গে প্রাণের বন্ধন ছিন্ন হলে গানে কেবল শক্তিরই প্রকাশ ঘটে। ভক্তির অভাব যেখানে প্রবল মুক্তি সেখানে প্রবেশের পথ খুঁজে পায় না। রবীন্দ্রনাথের গান সেই অভয়বাণী উচ্চারণ করে যা জগতসংসারের বিচিত্র বন্ধনকে মূল্য দিয়েও পাঠক-শ্রোতার চৈতন্যে মুক্তির আনন্দে অবগাহনের অবসর রচনা করে।

স্রষ্টায় সমর্পণের পরিতৃপ্তি অন্তরে কেবল পুলক জাগায় না, আলোকপ্রাপ্তিও ঘটায়। আগেই বলেছি, প্রভুর হাতের বীণা হয়ে নিজেকে বাজানোর আনন্দ উপভোগ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই প্রভাতের আলোর মতোই কবিচিত্ত ঝলমল করে ওঠে। কবির অন্তর্গত সুর তখন শিশুর মনের মতোই নির্মল, মায়ের মুখের হাসির মতো মনোহর। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এই সুরের সম্মোহন তাঁকে আরো অতৃপ্ত করে তোলে, তাই আরো সুর আরো তানের জন্য কান পেতে থাকেন কবি। অন্ধকার কেটে গিয়ে যখন আলোকিত দিনের যাত্রা শুরু হয়, সেই আলোর ঝর্ণাও কবির কণ্ঠে গানের মালা পরিয়ে দেয়। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ করি :

ক. বাজাও আমারে বাজাও
বাজালে যে সুরে প্রভাত-আলোরে সেই সুরে মোরে বাজাও ॥
যে সুর ভরিলে ভাষাভোলা গীতে শিশুর নবীন জীবনবাঁশিতে
জননীর-মুখ-তাকানো হাসিতে— সেই সুরে মোরে বাজাও ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৯৯/৪৬)

খ. আরো আলো আরো আলো
এই নয়নে, প্রভু, ঢালো।
সুরে সুরে বাঁশি পুরে
তুমি আরো আরো আরো দাও তান ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১০৯/৫০)

গ. ভোর হল বিভাবরী পথ হল অবসান—
শুন ওই লোকে লোকে উঠে আলোকেরই গান ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২৭০/১১৬)

আলোর জন্য মানুষের অস্থিরতা তীব্রতর হলেও জীবনে অন্ধকার আসে, তাকে স্বীকার করেই সৃজনশীল মানুষকে জীবনের সদর্থক প্রান্ত অন্বেষণের চেষ্টা করতে হয়। অন্ধকারকে আলিঙ্গনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নঞর্থক চৈতন্যের প্রকাশ ঘটে নি, বরং অন্ধকারের ভীতি-সঞ্চারী বৈশিষ্ট্যকে অবজ্ঞা করেছেন তিনি। তাঁর গীত-বাণীতে ব্যবহৃত 'অন্ধকার' থেকে আলোর দূরত্ব খুব বেশি নয়। রবীন্দ্রনাথের অন্ধকার তাই রমণীয়, আলোর সান্নিধ্য লাভের প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে উপভোগ্য। উপরে উদ্ধৃত আলো-আশ্রয়ী দৃষ্টান্তসমূহের সঙ্গে নিচের অন্ধকার-অবলম্বী উদাহরণগুলো মিলিয়ে পাঠ করলেই আমরা অনুভব করতে পারব, তাঁর গীত-বাণীতে আলো ও অন্ধকার কী গভীর সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ হয়ে পরিতৃপ্ত, পূর্ণাঙ্গ কিংবা পরিণত জীবনের ছবি তৈরি করছে :

ক. যদি নিশার তিমির গিয়া টুটে আমার হৃদয় জেগে ওঠে,
তবে মুখর হবে সকল আকাশ আনন্দময় গানের রবে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৮০/৩৮)

খ. জানি না কোথা অনেক দূরে বাজিল গান গভীর সুরে,
সকল প্রাণ টানিছে পথ পানে
নিবিড়তর তিমির চোখে আনে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১২৯/৬০)

গ. বিশ্ব যখন নিদ্রামগন, গগন অন্ধকার,
কে দেয় আমার বীণার তারে এমন ঝঙ্কার ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১৩৬/৬৩)

ঘ. যদি বাতাসে বহিল প্রাণ
কেন বীণায় বাজে না গান (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১৪৯/৬৯)

ঙ. আমার ব্যথা যখন বাজায় আমায় বাজি সুরে—
সেই গানের টানে পারো না আর রইতে দূরে।
লুটিয়ে পড়ে সে গান মম ঝড়ের রাতের পাখি-সম,
বাহির হয়ে এসো তুমি অন্ধকারে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১৬৪/৭৫)

চ. কে যায় অমৃতধাম যাত্রী।
আজি এ গহন তিমিররাত্রি,
কাঁপে নভ জয়গানে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২৫২/১১০)

ছ. এই নিশীথের স্বপ্নরাজি
নবজাগরণক্ষণে সব গানে উঠে যেন বাজি। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৫৮৮/২৩১)

যে-মানুষ আলো-অন্ধকারের বৃন্ত থেকে জীবনের সৌন্দর্য ছিনিয়ে আনতে পারেন, তাঁর আনন্দ অসীম, অগাধ। তিনি হাত বাড়ালেই আকাশ ছুঁতে পারেন, কিংবা আকাশই তাঁর হাতের সীমায় এসে ধরা দেয়। তাই তিনি পরানে অমৃতগানের অমিত সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি অনুভব করেন, আনন্দ সেখানে বাণী-ছন্দ-তানের শৃঙ্খলে আবদ্ধ নয়। গানের হাওয়া এসে জীবনের যাবতীয় জঞ্জাল উড়িয়ে নিয়ে যায় : 'আমার পরাণ-বীণায় ঘুমিয়ে আছে অমৃতগান–/তার নাইকো বাণী, নাইকো ছন্দ, নাইকো তান।/তারে আনন্দের এই জাগরণী ছুঁইয়ে দাও।/বিশ্বহৃদয়-হতে-ধাওয়া প্রাণে-পাগল গানের হাওয়া,/সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার নুইয়ে দাও ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৯২/৪৩)। রবীন্দ্রনাথের আনন্দ-বিষয়ক ভাবনা চমৎকার শিল্পসংহতি লাভ করেছে তাঁর *ধর্ম* গ্রন্থের 'আনন্দরূপ' শীর্ষক প্রবন্ধে। তিনি উপনিষদের আনন্দ-আশ্রয়ী বিভিন্ন শ্লোকের আলোকে তাঁর আত্মখচিত আনন্দের স্বরূপ চিহ্নিত করেছেন রচনাটিতে। কবির গীত-বাণীতে বিম্বিত আনন্দের প্রকৃতি অনুধাবনের প্রয়োজনে আমরা তাঁরই গদ্যের শরণ নিতে চাই :

> ধূলিকে আজ ধূলি বলিয়া অবজ্ঞা করিয়ো না, তৃণকে আজ তৃণজ্ঞান করিয়ো না— তোমার ইচ্ছায় এ ধূলিকে পৃথিবী হইতে মুছিতে পারিবে না, এ ধূলি তাঁহার ইচ্ছা; তোমার ইচ্ছায় এ তৃণকে অবমানিত করিতে পার না, এ শ্যামল তৃণ তাঁহারই আনন্দ মূর্তিমান। তাঁহার আনন্দপ্রবাহ আলোকে উচ্ছ্বসিত হইয়া আজ বহুলক্ষক্রোশ দূর হইতে নবজাগরণের দেবদূতরূপে তোমার সুপ্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, ইহাকে ভক্তির সহিত অন্তঃকরণে গ্রহণ করো, ইহার স্পর্শের যোগে আপনাকে সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত করিয়া দাও। (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ৭/৫৪২-৪৩)

এই উদ্ধৃতিতে আমরা আনন্দের যে প্রকৃতি ও প্রভাব লক্ষ করি, তা তাঁর গীত-বাণীর আনন্দেরই অনুরূপ। স্রষ্টাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে পারলে সামান্য বস্তুও অসামান্য

ব্যঞ্জনাসঞ্চারী হয়ে ওঠে। তখনই প্রাণ খুলে বলা যায় : 'হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে,/ওহে বীর, হে নির্ভয় ॥/জয়ী প্রাণ, চিরপ্রাণ, জয়ী রে আনন্দগান,/জয়ী প্রেম জয়ী ক্ষেম, জয়ী জ্যোতির্ময় রে ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩৭৪/১৫৫)। যে জ্যোতির্ময়ী পৃথিবীর সকল অগতির গতি, তাঁরই স্পর্শে অতি ক্ষুদ্র হয়ে ওঠে অসম্ভব সৌন্দর্য ও আনন্দের আধার। তখন মনের মধ্যে যে বোধ জাগ্রত হয়, রবীন্দ্রনাথের গদ্যভাষ্যে তার সন্ধান করা যেতে পারে :

> তুমি যতটা দিতেছ, আমি সমস্তটাই লইব। আমি ছোটোটার জন্য বড়োটাকে বাদ দিব না, আমি একটার জন্য অন্যটা হইতে বঞ্চিত হইব না, আমি এমন সহজ ধন লইব, যাহা দশ ছাপাইয়া আছে, যাহার অর্জনে আনন্দ, রক্ষণে আনন্দ, যাহার বিনাশ নাই, যাহার জন্য জগতের কাহারও সঙ্গে বিরোধ করিতে হয় না। (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ৭/৫৪৪)

বিশ্বকবির গীত-বাণী এই আনন্দলোকেরই উজ্জ্বল উচ্চারণ। এই আনন্দ-আলোয় অবগাহনের অভিজ্ঞতা যার আছে তার স্পর্শে কষ্টের অভিঘাতও গান হয়ে ওঠে, অতৃপ্তির নিঃসরণ থেকে ব্রহ্মানুসন্ধানের অভিজ্ঞান নির্মিত হয়। তিনি মনে করেন, দুঃখের তপস্যায় সিক্ত হলেই রিক্ত-হৃদয়ের দহন থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। কবির গীত-বাণীর আনন্দ-আশ্রয়ী পঙ্‌ক্তিমালা প্রসঙ্গে একজন সমালোচকের মন্তব্য এখানে উদ্ধার করছি :

> রবীন্দ্রনাথের সংগীতে দুঃখজয়ের প্রমুক্ত প্রেরণা ও আধ্যাত্মিক সত্যদর্শন আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ভাবতেন, জাগতিক অসংখ্য যন্ত্রণা ও দুঃখ থেকে পালিয়ে যাওয়া যায় না, তবু অনিবার্য কষ্ট থেকে মনকে মুক্ত ক'রে সমুচ্চ ভাবের ও আনন্দের লোকে নিয়ে যেতে পারলে বাহ্য দুঃখবেদনা লাঘব হয়। বারে বারে গানের ভেতর তিনি সান্ত্বনা খুঁজেছেন। গানই সেই আনন্দলোক এবং আনন্দই ব্রহ্ম। কবিগুরুর সংগীত-সাধনা ছিল এক অর্থে আনন্দ ও ব্রহ্ম-সন্ধান। (সুধাংশু, ১৯৮২ : ২৮৭)

এই মন্তব্যের মর্মবাণী বোধকরি এই যে রবীন্দ্রনাথের আনন্দের অন্তর্গত অনুরণন ও অনুপ্রেরণা দুঃখের গহ্বর থেকেই উৎসারিত। যন্ত্রণার গভীরতল ছুঁয়ে কবি নির্মাণ করেন আনন্দের উজ্জ্বল অবয়ব যা ব্রহ্মা-সন্দর্শন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সকল অবস্থায় সবকিছুর মধ্যে গান শোনার মধ্যে স্রষ্টার প্রতি তাঁর সমর্পণের চিহ্ন যেমন স্পষ্ট, তেমনি গানের সাধনায়ও পরিপূর্ণ নিবেদনের পরিচয় পাওয়া যায়। শান্তিদেব ঘোষ যথার্থই বলেছেন :

> তিনি মানুষের কোলাহলময় হাটে কোলাহলের মধ্যেই পূজার গান শুনেছেন। তাঁর কাছে আকাশের তলায় সংগীত– বিরাট সুদূরের মধ্যেও তিনি কী-এক উদাস-করা সংগীত শুনেছেন। ঘনবর্ষার জলধারার আঘাতে পুলককম্পিত পাতাগুলির শব্দে তিনি এক বীণকারের অঙ্গুলিঘাত লক্ষ করেন। বর্ষার প্রচণ্ড গর্জনে মনে ভাসে বাঁশির সুর। তাঁকে মৃত্যুপথের পথিক গান গাইতে বলে — পূর্ণতার আনন্দের গান। বনের মর্মরে, নদীর কল্লোলে, সকলের ভিতর থেকেই তিনি কি বিরাট সংগীতের অনুভূতি লাভ করেছেন। (শান্তিদেব, ১৪১৫ : ৩-৪)

রবীন্দ্রনাথের সংগীত তাঁর স্রষ্টার মতোই সর্বত্রবিস্তারী এবং সর্বত্রগামী। তাই তাঁর গীত-বাণীতে স্রষ্টা-প্রসঙ্গে সংগীত এবং সংগীত-প্রসঙ্গে স্রষ্টার শরণ লক্ষ করা যায়। জীবনানন্দ দাশের উজ্জ্বল উক্তি — 'কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দুইরকম উৎসারণ' (জীবনানন্দ, ২০০২ :

১৭)-এর অনুকরণে রবীন্দ্রনাথের গীত-বাণী প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই বলা যায় : স্রষ্টা ও সংগীত একই অনুভূতিরই দুরকম উদ্ভাসন। তাঁর আনন্দ-আশ্রয়ী গীত-বাণী থেকে আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করছি :

ক. রক্তধারার ছন্দে আমার দেহবীণার তার
বাজাক আনন্দে তোমার নামেরই ঝঙ্কার। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১০৮/১/৫০)

খ. জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া-মাঝে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১৪৪/৬৭)

গ. আজি বহিছে বসন্তপবন সুমন্দ তোমারি সুগন্ধ হে।
কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান, চাহে তোমারি পানে আনন্দে হে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩০৮/১২৯)

ঘ. কী গাব আমি, কী শুনাব, আজি আনন্দধামে।
পুরবাসী জনে এনেছি ডেকে তোমার অমৃতনামে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩০৪/১২৮)

ঙ. প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩১৬/১৩৩)

চ. সদা থাকো আনন্দে, সংসারে নির্ভয়ে নির্মলপ্রাণে ॥
জাগো প্রাতে আনন্দে, করো কর্ম আনন্দে,
সন্ধ্যায় গৃহে চলো হে আনন্দগানে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩২৩/১৩৬)

ছ. আলো যে আজ গান করে মোর প্রাণে গো।
কে এল মোর অঙ্গনে কে জানে গো ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৫১৮/২০৪)

জ. গভীর সংগীত দ্যুলোকে ধ্বনিছে গম্ভীর পুলকে,
গগন-অঙ্গন-আলোকে উদার দীপদীপ্তিমা।
চিত্তমাঝে কোন্ যন্ত্রে কী গান মধুময় মন্ত্রে বাজে রে
অপরূপ তন্ত্রে, প্রেমের কোথা পরিসীমা ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৫২৩/২০৭)

ঝ. চিরদিবস নব মাধুরী, নব শোভা তব বিশ্বে —
নব কুসুমপল্লব, নব গীত, নব আনন্দ ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৫৩৮/২১২)

আনন্দ যেখানে এত বৈচিত্র্যের আধার, সেখানে সুন্দরও স্বরাট্ এবং স্বতঃস্ফূর্ত। রবীন্দ্রনাথের পাঠকমাত্রই জানেন, তাঁর অধিকাংশ কবিতায়-গানে-গদ্যরচনায় 'সুন্দর' পরমস্রষ্টারই প্রতিরূপ হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। *পুনশ্চ* কাব্যের 'সুন্দর' শীর্ষক কবিতায় আকাশে মেঘ ও রোদ্দুর লুকোচুরি খেলছে — এমন একটি দিনকে কবির মনে হচ্ছে 'প্লাটিনমের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে'। এমন দিনে 'প্রেয়সীকে মনে হয় সে আমার জন্মান্তরের জানা — /যে কালে স্বর্গ, যে কালে সত্যযুগ,/যে কাল সকল কালেরই ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২০০৬ : ৮/২৫৯)। এই সৌন্দর্যের আবহে স্রষ্টার উপস্থিতি অনেকটাই যেন দৃশ্যমান, তবু 'ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে'। এবার লক্ষ করা যাক রবীন্দ্রনাথ সুন্দরকে গদ্যভাষ্যে কীভাবে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে *শান্তি নিকেতন* গ্রন্থের 'সুন্দর' থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করি :

> মানবপ্রকৃতিকে বাদ দিয়ে দেখলে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে জটিলতা নেই; এইজন্যে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সুন্দরকে দেখা ও ভূমাকে দেখা সহজ। ছোটো করে দেখতে গেলে তার মধ্যে যে-সমস্ত বিরোধ ও বিকৃতি চোখে পড়ে সেগুলিকে বড়োর মধ্যে মিলিয়ে দিয়ে একটি বৃহৎ সামঞ্জস্যকে দেখতে পাওয়া আমাদের মধ্যে তেমন কঠিন নয়।
>
> কিন্তু, মানুষের সম্বন্ধে এটি আমরা পেরে উঠি নে। মানুষ আমাদের এত অত্যন্ত কাছে যে তার সমস্ত ছোটোকে আমরা বড়ো করে এবং স্বতন্ত্র করে দেখি। যা তার ক্ষণিক ও তুচ্ছ তাও আমাদের বেদনার মধ্যে অত্যন্ত গুরুতর হয়ে দেখা দেয়; কাজেই লোভে ক্ষোভে ভয়ে ভাবনায় আমরা সমগ্রকে গ্রহণ করতে পারি নে, আমরা একাংশের মধ্যে দোলায়িত হতে থাকি। এইজন্যে এই বিশাল সন্ধ্যাকাশের মধ্যে যেমন সহজে সুন্দরকে দেখতে পাচ্ছি মানবসংসারে তেমন সহজে দেখতে পাই নে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২০০৬ : ৮/৬৫৬)

রবীন্দ্রনাথ সত্য ও সুন্দরকে সমান্তরালে স্থাপন করে এই দুইয়ের স্পর্শে নির্মল দৃষ্টি এবং পবিত্র অন্তঃকরণ সৃজনের তাগিদ দিয়েছেন, বলেছেন, 'সত্যকে যখন আমরা সুন্দর করে জানি তখনই সুন্দরকে সত্য করে জানতে পারি। সত্যকে সুন্দর করে সেই জানে যার দৃষ্টি নির্মল, যার হৃদয় পবিত্র, বিশ্বের মধ্যে সর্বত্রই আনন্দকে প্রত্যক্ষ করতে তার আর কোথাও বাধা থাকে না।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২০০৬ : ৮/৬৫৯) নিচের উদাহরণগুলোতে আমরা সেই সুন্দরেরই সাক্ষাৎ পাই যা আনন্দের ছদ্মবেশে আমদের সত্যের সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দেয় :

ক. কর সুন্দর গীতমুখর নীরব আরাধন
অক্ষয়করুণাধন (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১২৭/৫৮)

খ. নাই যে কুসুম, মালা গাঁথব কিসে! কান্নার গীত বীণায় এনেছি যে,
দূর হতে তাই শুনতে পাবে অন্ধকারে সুন্দর হে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৫৩১/২১০)

গ. তুমি সুন্দর, যৌবনঘন রসময় তব মূর্তি,
দৈন্যবরণ বৈভব তব অপচয়পরিপূর্তি ॥
নৃত্য গীত কাব্যছন্দ কলগুঞ্জন বর্ণ গন্ধ—
মরণহীন চিরনবীন তব মহিমামূর্তি ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৫৩২/২১০)

রবীন্দ্রনাথের গানে স্রষ্টার উপস্থিতিতে বৈচিত্র্যের স্বাক্ষর স্পষ্ট। বিশ্বকর্মার সৃষ্টিসম্ভারকে তিনি যেমন নানা রূপেরসে উপভোগ্য করে তুলেছেন, তেমনি ভগবানকে দিয়েও কবি তাঁর কাঙ্ক্ষিত গান গাইয়ে নিয়েছেন : 'দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে-দেওয়া তোমায় আমায়—/জনম জনম এই চলেছে, মরণ কভু তারে থামায়? ।/যখন তোমার গানে আমি জাগি আকাশে চাই তোমার লাগি,/আবার একতারাতে আমার গানে মাটির পানে তোমায় নামায় ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩৪৬/১৪৩)। সৃষ্টিকর্তা যেন নিজেই তাঁর সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টার সৃষ্টিকে তাঁর শিল্পচৈতন্য দিয়ে আরো পরিশীলিত ও পরিণত করেছেন, নিজের সৃষ্টি দিয়ে তিনি স্রষ্টার আনন্দকে অভিনব করে তুলেছেন। তিনি স্রষ্টাকে 'কবি' সম্বোধন করে কবিপ্রতিভার সৌরভ ও গৌরবকে মহিমান্বিত করেছেন। তাই 'বাজাও তুমি, কবি, তোমার সঙ্গীত সুমধুর, গম্ভীরতর তানে প্রাণে মম—' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২৭৭/১১৮) — এই গীত-বাণীতে ভগবানের বাণী গানের মতো বেজে উঠেছে। আবার 'নিশিদিন মোর পরানে প্রিয়তম মম/কত-না বেদনা দিয়ে বারতা পাঠালে ॥/ভরিলে চিত্ত মম নিত্য তুমি প্রেমে প্রাণে গানে হায়/থাকি আড়ালে ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৪২১/১৭১) —

এই গানে আমরা লক্ষ করছি কবির প্রাণের বীণায় ভগবানের বাণীর প্রকাশ ঘটেছে প্রেমের রূপকল্পে, যা গানের ভেতর দিয়েই গভীর ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠছে। প্রিয় ও দেবতার ক্রমাগত স্থান বদলের মতোই প্রেম ও গীতের অন্তরঙ্গতার নানা চিহ্ন তাঁর গীত-বাণীতে ছড়িয়ে আছে। তাই ভগবান যখন গান করেন, সেই গান সৃষ্টির প্রতি তাঁর নিবিড়তম প্রেমেরই প্রতিভূরূপে প্রকাশ পায়। একইভাবে স্রষ্টা যখন তাঁর প্রেমপাত্র হাতে নানা রূপে-অরূপে সৃষ্টির সান্নিধ্যে আসেন, সৃষ্টি তখন মধুর-মুখর গান শুনতে পান। ভগবান গীতছন্দেই তাঁর অবদান সম্পর্কে সৃষ্টিকে অবহিত করেন। আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিই :

ক. শুভ্র নব শঙ্খ তব গগন ভরি বাজে,
ধ্বনিল শুভ জাগরণগীত। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২৬৪/১১৪)

খ. আকাশে দিবানিশি উথলে সঙ্গীতধ্বনি তাঁহার,
কে শুনে সে মধুবীণারব—
অধীর বিশ্ব শূন্যপথে হল বাহির ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২৮৭/১২১)

গ. ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত-অম্বর-মাঝে
দিকে দিগন্তরে ভুবনমন্দিরে শান্তিসঙ্গীত বাজে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩০৩/১২৭)

ঘ. অন্ত নাহি জানে মহাকাল মহাকাশ,
গীতছন্দে করে প্রদক্ষিণ। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৪৭২/১৮৬)

ঙ. এই গোধূলির ধূসরিমায় শ্যামল ধরার সীমায় সীমায়
শুনি বনে বনান্তরে অসীম গানের রেশ ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৬০৪/২৩৭)

চ. মনে হল আকাশ যেন কইল কথা কানে কানে।
মনে হল সকল দেহ পূর্ণ হল গানে গানে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২৬৭/১১৫)

ছ. বারে বারে তুমি আপনার হাতে স্বাদে সৌরভে গানে
বাহির হইতে পরশ করেছ অন্তরমাঝখানে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৪৯৮/১৯৭)

জ. যদি প্রেম দিলে না প্রাণে
কেন ভোরের আকাশ ভরে দিলে এমন গানে গানে?। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৫২১/২০৬)

রবীন্দ্রনাথের গীত-বাণীতে স্রষ্টা যেমন শিল্পীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তেমনি স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে রবীন্দ্রনাথকেও আমরা গান গাইতে দেখি। নিজের বীণায় ভগবানের বাণী শুনতে পেয়েছেন কবি। নিজের অভিপ্রায় এখানে প্রধান নয়, স্রষ্টার সুরকে নিজের করে নেয়ার মধ্যেই কবি তাঁর সৃষ্টির সার্থকতা অনুভব করেছেন : 'গেয়েছি গান যত আপন মনে খ্যাপার মতো/সকল সুরে বেজেছে তার আগমনী —/সে যে আসে, আসে, আসে ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১৩০/৬০)। কবির স্রষ্টা কিংবা জীবনদেবতা কবিকে দিয়ে তাঁর অস্তিত্বের গৌরব ঘোষণা করেছেন। কবির গানে স্রষ্টার আগমনী সুর তাঁর গীত-বাণীকে মহিমান্বিত করেছে। কবির চৈতন্যে স্রষ্টার নৈঃসঙ্গ্য যেমন সংগীত হয়ে উঠেছে, তেমনি তাঁর গানের কথা ও সুর স্রষ্টার দান হিসেবে গৃহীত হয়েছে। কবির সকল চিন্তা ও কাজে যে ছন্দ ও সুর ঝঙ্কৃত হয়েছে, সেখানে ভগবানের অস্তিত্বই প্রকাশিত। কবির জীবনের দীর্ঘ পথপরিক্রমায় স্রষ্টা নানা রূপে তাঁকে প্রাণিত করেছে, তাঁর দুঃখ-শোক, আনন্দ-বেদনা স্রষ্টার করুণায় সিক্ত হয়ে শিল্পের আসন অলংকৃত করেছে। 'ধ্বনিত বন বিহগকলতানে, গীত সব ধায় তব পানে।/পূর্বগগনে জগৎ জাগি উঠি গাহিল, পূর্ণ সব তব রচিত গানে।/প্রেমরস পান করি গান করি কাননে/উঠিল মন প্রাণ মম মাতি — হেরি

বিমলমুখভাতি ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩২৮/১৩৭) — এই গানে পৃথিবীর সমুদয় গীতসুধা স্রষ্টার অন্তরের বাণী হিসেবে চিত্রিত হয়েছে। সুরের সৌন্দর্যে ও সৌরভে স্রষ্টার কারুবাসনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ করে কবি গভীর অভিনিবেশ সহকারে সুরকে বাণীর আশ্রয়ে অর্থবহ করে তুলেছেন। কবির বাণীতে সৃষ্টিকর্তার হৃদয়খানিই নানা অবয়বে প্রকাশ পেয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর মধ্যে স্রষ্টার অস্তিত্ব ঘোষিত হলেও দূরের ভগবান ভীষণভাবে একা। তাই কবি তাঁকে সুরে-ছন্দে আপন করে নিতে চেয়েছেন। নিঃসঙ্গ স্রষ্টার একজন অনুরাগী হিসেবে তিনি ভগবানকে যেভাবে উপলব্ধি করেছেন, তারই প্রকাশ লক্ষ করি তাঁর পূজা-পর্যায়ের গীত-বাণীতে :

ক. সকল জীবন উদাস করিয়া কত গানে সুরে গলিয়া ঝরিয়া
তোমার বিরহ উঠিছে ভরিয়া আমার হিয়ার মাঝে হে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১৪০/১/৬৫)

খ. প্রতিদিন তব গাথা গাব আমি সুমধুর—
তুমি দেহো মোরে কথা, তুমি দেহো মোরে সুর — (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১৭৭/৮০)

গ. আরো আঘাত সইবে আমার, সইবে আমারো।
আরো কঠিন সুরে জীবন-তারে ঝঙ্কারো ॥
যে রাগ জাগাও আমার প্রাণে বাজে নি তা চরম তানে,
নিঠুর মূর্ছনায় সে গানে মূর্তি সঞ্চারো ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২২৪/৯৮-৯৯)

ঘ. দীর্ঘ জীবনপথ, কত দুঃখতাপ, কত শোকদহন—
গেয়ে চলি তবু তাঁর করুণার গান ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২৫০/১০৯)

ঙ. যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে
মিলাব তাই জীবনগানে ॥
গগনে তব বিমল নীল — হৃদয়ে লব তাহারি মিল,
শান্তিময়ী গভীর বাণী নীরব প্রাণে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩৩৫/১৪০)

চ. সংসার যবে মন কেড়ে লয়, জাগে না যখন প্রাণ,
তখনো, হে নাথ, প্রণমি তোমায় গাহি বসে তব গান ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৪৭৯/১৮৯)

ছ. মাঝে মাঝে তার বারতা আমার ভাষায় পায় কি কথা রে,
ও সে আমায় জানি পাঠায় বাণী গানের তানে লুকিয়ে তারে বারে বারে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৫৪৬/২১৫)

রবীন্দ্রনাথের পূজার গানে আমরা লক্ষ করি, ভগবান প্রায়শই শ্রোতার আসন অলংকৃত করেছেন। কবি তাঁর কিছু গানের বাণীকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছেন যে মনে হয়, তিনি স্রষ্টার পায়ের কাছে বসে আপনমনে গান গাইছেন আর স্রষ্টা সেই গান শুনে নিজের সৃষ্টিকে নতুন করে অবলোকনের আনন্দে বিস্ময় প্রকাশ করছেন। কবি স্রষ্টার সামনে শূন্য হাতে দাঁড়াতে সংকোচ বোধ করেছেন। ভগবানের বাণী অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তির অন্তরঙ্গতা সহ্য করতে পারে না। তাই তিনি গানের মালা পরিয়ে স্রষ্টাকে বরণ করতে চেয়েছেন। অসম আদান-প্রদান সাধারণত স্বাস্থ্যকর হয় না। প্রসঙ্গত একজন সমালোচকের মন্তব্য স্মরণ করছি :

> নেওয়ার মধ্যে রিক্ততার দৈন্য রবীন্দ্রনাথের অনভিপ্রেত ছিল। দানের সঙ্গে প্রতিদানের আবশ্যিকতা তাঁর সংগত মনে হয়েছে। যে-আকাশ তাঁকে আলো দিয়ে ভরিয়েছে সেই আকাশকে তিনি ভরাতে চেয়েছেন গানে। দেওয়া-নেওয়ার এ মাধুর্যও কম নয়। (সুধীর, ২০০৮ : ২৪৫)

রবীন্দ্রনাথের 'আকাশ আমায় ভরল আলোয়, আকাশ আমি ভরব গানে।' — এই গানের বাণীকে কেন্দ্র করে সমালোচক কবির ঈশ্বর-ভক্তি কিংবা পরম-প্রীতির প্রকৃতি চিহ্নিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের অন্য অনেক গানেও আমরা কবির এই অভিব্যক্তির প্রকাশ লক্ষ করব। দুই পক্ষের দেয়া-নেয়ার মিলন-প্রত্যাশী কবি তাই শুধু স্রষ্টার গান শুনেই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন নি, নিজের গানের মাধ্যমে স্রষ্টার প্রাণে কবির প্রতি প্রেম জাগানোর চেষ্টা করেছেন। কবির গান শুনে স্রষ্টা স্বয়ং তাঁর সিংহাসন থেকে নেমে কবির 'বিজন ঘরের দ্বারের কাছে' এসে দাঁড়ান, আপন মনের কবির গান শুনে মুগ্ধ হন এবং গীতমুগ্ধ স্রষ্টা কবির জন্য বরণমালা রচনা করেন : 'একলা বসে আপন-মনে গাইতেছিলেম গান;/তোমার কানে গেল সে সুর এলে তুমি নেমে—/মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়ালে, নাথ, থেমে ॥/তোমার সভায় কত যে গান, কতই আছে গুণী—/গুণহীনের গানখানি আজ বাজল তোমার প্রেমে!' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২৯৫/১২৪)। অন্য একটি গীত-বাণীতে কবি স্রষ্টার মণিহার গলায় পরতে সংকোচ বোধ করছেন — বলছেন, তিনি কিছুতেই এই বরণমালার যোগ্য নন— 'এই মণিহার আমায় নাহি সাজে —/এরে পরতে গেলে লাগে, এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে ॥/কণ্ঠ যে রোধ করে, সুর তো নাহি সরে–/ওই দিকে যে মন পড়ে রয়, মন লাগে না কাজে ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৪৮৯/১৯৩)। বিনয়বিগলিত কবির মনে হয় স্রষ্টাকে তৃপ্ত করার মতো সংগীতকার তিনি নন, তবু তাঁরই গানে কান পেতে বিশ্বপ্রকৃতির সৌরভ-গৌরব-সমৃদ্ধি সম্পর্কে স্রষ্টার উপলব্ধি নতুন মাত্রা লাভ করে। আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করি :

ক. যা শোনাবার আছে গাব ওই চরণের কাছে,
দ্বারের আড়াল হতে শোনে বা কেউ না-শোনে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৮৮/৪১)

খ. তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে,
এসো গন্ধে বরনে এসো গানে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১৬৭/৭৬)

গ. কেহ শুনে না গান, জাগে না প্রাণ,
বিফলে গীত-অবসান —
তোমার বচন করিব রচন সাধ্য নাহি নাহি। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১৬৯/৭৭)

ঘ. হে চিরনূতন, আজি এ দিনের প্রথম গানে
জীবন আমার উঠুক বিকাশি তোমার পানে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২৭৩/১১৭)

ঙ. একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত গান সমাপ্ত হোক নীরব পারাবারে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৫০৪/২০০)

চ. উঠে সঙ্গীত তোমার পানে, গগন পূর্ণ প্রেমগানে
তোমার চরণ করেছে বরণ নিখিলজন ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৫২৭/২০৮)

ছ. আকাশ আজি গানের ব্যথায় ভরে আছে,
ঝিল্লিরবে কাঁপে তোমার পায়ের কাছে,
বন্দনা তোর পুষ্পবনের গন্ধধূপে—
আজ এসেছ ভুবনমোহন স্বপনরূপে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৫৩৩/২১০)

রবীন্দ্রনাথের অনেক গানেই আমরা লক্ষ করি, কবি গানের ভেতর দিয়ে নিজের প্রাণের সঙ্গেই এক ধরনের বোঝাপড়ার চেষ্টা করছেন। যা-কিছু বলছেন তার উৎস ও উদ্দেশ্য

একই, কেবল ভেতর-বাহিরের ব্যবধান এবং এই ব্যবধান মোচনের প্রয়াসকেই তিনি গানের অবয়বে ধারণ করেছেন। কবির অন্তরে যিনি কবির আসন অলংকৃত করেছেন, তিনিই স্রষ্টা। তাই হৃদয়-বনে যে ফুল ফোটে তা কবির মনমধুপকে আমন্ত্রণপত্র পাঠায় : 'নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে/তারি মধু কেন মনমধুপে খাওয়াও না?/নিত্যসভা বসে তোমার প্রাঙ্গণে/তোমার ভৃত্যেরে সেই সভায় কেন গাওয়াও না?।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩৫৯/১৪৯) — এই গীত-বাণীতে আত্মকথনের আবহে কবি তাঁর স্রষ্টাকে তাঁর অন্তরের অধিপতি হিসেবে আসন দিয়েছেন। এই স্রষ্টার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার প্রয়োজনেই তিনি তাঁর অন্তরকে বিকশিত করতে চেয়েছেন, নিকষিত হেম হিসেবে নিজেকে নিরীক্ষার পথেই অগ্রসর হয়েছেন তিনি। তাই 'আমি তার মুখের কথা শুনব ব'লে গেলাম কোথা,/শোনা হল না, হল না —/আজ ফিরে এসে নিজের দেশে এই-যে শুনি/শুনি তাহার বাণী আপন গানে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৫৪৯/২১৬) — এই গীতবাণীতে তিনি আকাশে হাত না-বাড়িয়ে নিজের দিকে মুখ ফিরিয়েছেন। তাই কবির গানের বাণী ভগবানের প্রাণের কথায় পরিপূর্ণ ও পরিতৃপ্ত হতে চায়। নিচের দৃষ্টান্তসমূহের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক :

ক. বেদনাদূতী গাহিছে, 'ওরে প্রাণ
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১২৯/৫৯)

খ. বেসুর বাজে রে,
আর কোথা নয়, কেবল তোরই আপন-মাঝে রে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১৫৪/৭১)

গ. এক মনে তোর একতারাতে একটি যে তার সেইটি বাজা—
ফুলবনে তোর একটি কুসুম, তাই নিয়ে তোর ডালি সাজা ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২৫৫/১১১)

ঘ. গানে আমার পুলক লাগে, চোখে ঘনায় ঘোর—
হৃদয়ে মোর কে বেঁধেছে রাঙা রাখীর ডোর?। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১৩৮/১৩৪)

ঙ. রক্তে তোমার দুলছে না কি প্রাণ?
গাইছে না মন মরণজয়ী গান? (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১৮৩/৮৩)

চ. সিন্ধু শৈল তটিনী মহারণ্য জলধরমালা
তপন চন্দ্র তারা গভীর মন্দ্রে গাহিছে শুন গান ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ২৬১/১১৩)

ছ. কোলাহল তো বারণ হল, এবার কথা কানে কানে।
এখন হবে প্রাণের আলাপ কেবলমাত্র গানে গানে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩৬১/১৫০)

আত্মপ্রতিকৃতি নির্মাণের এই সাংগীতিক কৌশলে রবীন্দ্রনাথের নিবেদন যেমন তাৎপর্যপূর্ণ, তেমনি সৃষ্টি ও স্রষ্টার সম্পর্কের নানা মাত্রা নির্দেশেও তা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। স্রষ্টায় সমর্পিত সাধক নিজেই কেবল জেগে থাকেন না, তিনি স্রষ্টাকেও তাঁর জাগরণের সঙ্গী করে নেন। স্রষ্টার কাছে তিনি গানে গানে তাঁর প্রাণের কথা তুলে ধরেন বলেই এই গান তপস্যার বাণী হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের গীত-বাণীর বৈচিত্র্য যেমন পাঠক-শ্রোতাকে পুলকিত করে তেমনি এর সংযত ও সুমিত বিস্তারে আমরা বিস্মিত হই। ভারতীয় সংগীতের গতিপ্রকৃতি এবং রবীন্দ্রনাথের অবদান মূল্যায়ন করতে গিয়ে একজন সমালোচক বলেছেন :

> ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা ছিল এমনি নিটোল একটি বস্তুর যাতে বৈচিত্র্য থাকবে কিন্তু বাহুল্য থাকবে না, ভাব থাকবে কিন্তু তা উচ্ছ্বাসে ফেনিল হয়ে উঠবে না, যার একটি সুসংগঠিত নিজস্ব রূপ থাকবে কিন্তু অতিরিক্ত বিন্যাসে জটিল হয়ে পড়বে না। রবীন্দ্রনাথের সংগীতসৃষ্টিতেও একই লক্ষণ বর্তমান। (রাজ্যেশ্বর, ১৩৬৮ : ২০৫-২০৬)

রবীন্দ্র-সংগীতের বাণী-বিন্যাসে বাহুল্যের ভার যেমন নেই, তেমনি অমিত ও অসংযত আবেগের প্রকাশও তাতে অনুপস্থিত। কবির জীবনযাপনে এক ধরনের শৈল্পিক পরিকল্পনার প্রকাশ লক্ষ করেছি। মৃত্যু সম্পর্কেও তাঁর বিবেচনা নান্দনিক অভিব্যক্তি লাভ করেছে। জীবন ও গানকে তিনি সমার্থক ভেবেছেন এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। 'সাঙ্গ যবে হবে ধরার পালা/যেন আমার গানের শেষে থামতে পারি শমে এসে —/ছয়টি ঋতুর ফুলে ফলে ভরতে পারি ডালা।' (৫৯৪/২৩৩-৩৪) — এই গানে কবির মৃত্যুচিন্তার প্রকাশ যেমন সংহত, তেমনি জীবনকে সার্থক-সুন্দর-পরিপূর্ণ করার প্রতিজ্ঞাও এতে অনুচ্চারিত নয়। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য বলেছেন : 'জীবনকে তিনি [রবীন্দ্রনাথ] যেমন সকল মনপ্রাণ দিয়া ভালোবাসিয়াছেন মৃত্যুকেও তেমনি অস্বীকার করেন নাই। মরণকে তিনি এই জীবনের পরিণতি বলিয়া মনে করিয়াছেন।' (বিজন, ১৯৬১ : ১৭৬)। জীবনকে পরিণত রূপ দেয়ার মানসেই মরণকে বারবার গানের সুরে কাছে ডেকেছেন কবি, মরণ হতে জেগেও উঠতে চান গানের সুরে। গানকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই বিবেচনা করেছেন তিনি। তাঁর কাছে জাগরণ মানেই গান, তাই প্রাণের স্পর্শমাত্রই গান গেয়ে উঠতে চান কবি :

তোমার কাছে এ বর মাগি, মরণ হতে যেন জাগি
গানের সুরে ॥
যেমনি নয়ন মেলি যেন মাতার স্তন্যসুধা-হেন
নবীন জীবন দেয় গো পুরে গানের সুরে ॥
সেথায় তরু তৃণ যত
মাটির বাঁশি হতে ওঠে গানের মতো।
আলোক সেথা দেয় গো আনি
আকাশের আনন্দবাণী,
হৃদয়মাঝে বেড়ায় ঘুরে গানের সুরে ॥ (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ১৭/১২)

'পূজা'-পর্যায়ের গানে রবীন্দ্রনাথের নৈবেদ্য বিচিত্র উপকরণে সজ্জিত হলেও গানই তাঁর সকল আয়োজনকে ছাপিয়ে গেছে। গানে গানে তাঁর প্রার্থনা এক সময় বোধকরি গানের প্রার্থনায় সমর্পিত হয়েছে। স্রষ্টা ও সংগীত সেখানে একই বৃন্তে বিকশিত। তাঁর গীত-বাণীর গান-আশ্রয়ী পঙ্‌ক্তি বা পঙ্‌ক্তিমালা কেবল গানের কথায় সীমাবদ্ধ থাকে না, গানের রূপকল্পে কবির অনুভূতির বিচিত্র প্রান্তকেই তা পল্লবিত করে। রবীন্দ্রসংগীত শুনে তো বটেই *গীতবিতান* পাঠ করেও আমরা এই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হই। কবি ও শিল্পসমালোচক শঙ্খ ঘোষের শরণ নিচ্ছি :

> গীতশিল্পী বলেন, গান শুনবার, পড়বার নয়। স্রষ্টা নিজেও আমাদের সতর্ক করে দেন বারেবারে, তাঁর এ-রচনা শুনবার জন্য, পড়বার জন্য নয়। গীতসুধার জন্য পিপাসিত চিত্ত সেকথা মেনেও নেয় ভিতরে-ভিতরে। কিন্তু তবু আমরা, যারা সবসময়েই গান শুনবার সুযোগ

> পাব না হয়তো, অন্তত মনের মতো গান, আমাদের মনে পড়বে যে দ্বিতীয় সংস্করণ 'গীতবিতান'কে রবীন্দ্রনাথ সাজিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁর নতুন একটি কাব্যগ্রন্থ হিসেবেই, 'গীতবিতান' পড়তেও চাইব আমরা, সমান উৎসাহে। আর যদি তা পড়ি, তাহলে, যেমন আমরা সুরবিহীনভাবেও মুগ্ধ হব এর শব্দের বা ছবির নিরর্গল ধারায়, তেমনি এর ছন্দও আমাদের আকর্ষণ করবে তার সামর্থ্যে, তার বৈচিত্র্যে, কথার ভিতর থেকে আপনিই তার সুর বার করে আনবার সহজ আনন্দে। (শঙ্খ, ২০০৮ : ১২২)

এই 'সহজ আনন্দের' টানই কবির গানের বাণীকে পাঠকের প্রাণের কাছে নিয়ে আসে। রবীন্দ্রনাথের গীত-বাণীর গান-অনুষঙ্গেও আমরা লক্ষ করি মানুষের জীবনে আনন্দের বেদনা ও বেদনার আনন্দ কীভাবে হাত ধরাধরি করে মানুষকে সামনে এগিয়ে চলতে শেখায়। এই এগিয়ে চলাকেই কবি গানের ছন্দে-আনন্দে রূপ দেয়ার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর গানে পথ-চাওয়ার অতৃপ্ত আনন্দ পথ-পাওয়ার পরিতৃপ্ত প্রশান্তির দিকে ধাবিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ *সেঁজুতি* কাব্যের 'পরিচয়' কবিতায় তাঁর পৃথিবীতে আগমন ও অর্জনকে চমৎকার রূপকল্পে ছন্দোবদ্ধ করেছেন। নামপরিচয়হীন মানুষ কীভাবে 'আমাদের লোক' হয়ে উঠল তারই ছবি এই কবিতায় চিত্রিত। জীবনতরীর মুগ্ধ মাঝি হিসেবে তিনি লক্ষ্য অর্জনে আত্মনিয়োগ করলেন, সেই আত্মদান সংগীতে ভর দিয়ে অর্থবহ হয়ে উঠল। নিঃসঙ্গ যৌবনের বেদনাকে তিনি সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইলেন গানের সুরে :

নদীতে লাগিল দোলা, বাঁধনে পড়িল টান,
একা বসে গাহিলাম যৌবনের বেদনার গান।
সেই গান শুনি
কুসুমিত তরুতলে তরুণতরুণী
তুলিল অশোক,
মোর হাতে দিয়ে তারা কহিল, 'এ আমাদেরই লোক।' (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ১১/১৫৫)

তারপর কবির তরীখানা অনেক ঝড়-জল অতিক্রম করেছে। ততদিনে জীবনের বিচিত্র অর্জনে নিজের ব্যক্তিসত্তা ও শিল্পচৈতন্যের গতিবিধি চিহ্নিত হয়ে গেছে। তরী তখনো তলিয়ে যায় নি, ভেসেই চলেছে। 'নূতন কালের নব যাত্রী ছেলেমেয়ে' জানতে চাইছে তাঁর পরিচয়। তারা লক্ষ করছে, 'সন্ধ্যার তারার দিকে' তরী বেয়ে চলে যাচ্ছেন একজন, জানতে চাইছে, কী তাঁর পরিচয়। যৌবনের গান থেকে বার্ধক্যের বেদনায় এসেও তিনি সেই প্রশ্নের জবাব দিতে সংগীতেরই শরণ নিচ্ছেন :

সেতারেতে বাঁধিলাম তার,
গাহিলাম আরবার—
মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরই লোক
আর কিছু নয়,
এই হোক শেষ পরিচয়। (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ১১/১৫৫)

রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় নিজেই মাঝির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং জোয়ার ভাটার যুগলযাত্রায় জীবনের যাবতীয় অভিজ্ঞতা ও অর্জনকে সংগীতের দর্পণে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে

তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র শিল্পকর্মই এই সংগীত-অনুষঙ্গে প্রতিভাত। আসা-যাওয়ার পথের ধারে বসে নানাজনের পারাপারের দৃশ্য অবলোকন করেছেন কবি, শেষ পারানীর কড়ি হিসেবে তিনি গানকেই কণ্ঠে ধারণ করেছেন। গানের ভেতর দিয়ে দেখা ভুবনকে বড় আপন মনে হয়েছে তাঁর। এই ভুবনের সকল লেনা-দেনা শেষ করে তিনি যখন ভুবনেশ্বরের কাছে পৌঁছাতে চাচ্ছেন, তখনো কণ্ঠে সেই গানেরই মালা। 'চলে যাব গান গাহি —/কে রহিবে আর দূর পরবাসে ॥' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৭১ : ৩৯০/১৬১) — এই গীত-বাণীতে তিনি নিজেকে প্রবাসী কল্পনা করলেও আক্ষরিক অর্থেই তিনি 'পৃথিবীর কবি'। তাই তাঁর গানের পৃথিবীতে আমাদের আনাগোনা আনন্দময় হয়ে ওঠে। 'আমি তোমাদেরই লোক' — একথা বলার অধিকার কবির নিশ্চয়ই আছে, তবু তাঁর সৃজনবিশ্বের সকল প্রান্ত পরিভ্রমণ শেষে পাঠকের বলতে ইচ্ছে করবে, গানের রবীন্দ্রনাথ সন্দেহাতীতভাবে 'আমাদেরই লোক'।

টীকা

১. প্রাবন্ধিক-গবেষক হায়াৎ মামুদ তাঁর *ভ্রমি বিস্ময়ে* গ্রন্থের 'দুই যৌবনে কৃষ্ণ শোণিত' প্রবন্ধে বাঙালির জীবনে রবীন্দ্রনাথের গানের বহুবিস্তৃত প্রভাব সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, এ-প্রসঙ্গে তার শরণ নেয়া যেতে পারে–

একদা যে তিনি [রবীন্দ্রনাথ] আশা পোষণ করেছিলেন, বাংলা দেশের লোককে তাঁর গান গাইতেই হবে, বর্তমানে তা অবিশ্বাস্য সত্য। ফলে যে-রবীন্দ্রনাথ আমাদের আত্মার সঙ্গী তিনি রাজকবি নন, সুরের গুরু। রবীন্দ্র-মিথের জনকও তাই যত না রবীন্দ্রনাথের কবিতা, তদপেক্ষা বহুগুণ বেশী তাঁর 'সংগীত মধুরিমা'। এই সংগীতেরই কল্যাণে তাঁর প্রতিকৃতি বারংবার খণ্ডিত হয়ে সামনে দাঁড়ায়। (হায়াৎ, ১৯৮৯ : ১)

২. এই রচনায় রবীন্দ্রনাথের গানের মূলপাঠ (text) *গীতবিতান* ১, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৯৭১ থেকে গৃহীত হয়েছে। উদ্ধৃতি শেষে বন্ধনী-চিহ্নের ভেতর গানের ক্রমিক-সংখ্যা এবং পৃষ্ঠা-সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে। এই রচনায় মুখ্যত কবির গানের বাণীর দিকেই অধিকতর মনোযোগ দেয়া হয়েছে। তাই কোন গীত-বাণীর অংশবিশেষ উপস্থাপনে *গীতবিতানের* পঙ্‌ক্তিসজ্জা কিংবা স্তবকবিন্যাস সর্বত্র সংরক্ষিত হয় নি।

৩. এ-প্রসঙ্গে শামসুর রাহমানের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। আবুল হাসনাত সম্পাদিত *নানা রবীন্দ্রনাথের মালা* গ্রন্থের 'রবীন্দ্রনাথের গান, আমার অনুভূতি' শীর্ষক রচনায় তিনি বলেছেন — রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো পূজার গান কখন যে প্রেমের গান হয়ে যায়, আবার কোনো কোনো প্রেমগীতি কোন্ অলৌকিক ছলে ছুঁয়ে যায় পূজার গানের সীমানা। তাই, গীতবিতানের পাতাগুলি কখনো হঠাৎ এলোমেলো হয়ে গেলে পূজা ও প্রেমের মধ্যে বাসাবদল হতে বেশি দেরি হবে বলে মনে হয় না। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮১ : ২৬০)

৪. বর্তমান নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিতা কিংবা গদ্যের উদ্ধৃতসমূহ, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ঐতিহ্য সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ ২০০৬ থেকে গৃহীত হয়েছে। উদ্ধৃতি শেষে খণ্ড-সংখ্যা এবং পৃষ্ঠা-সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন *রবীন্দ্র-রচনাবলী* দ্বাদশ খণ্ডের ৫৭৭ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত হলে উদ্ধৃতি-শেষে (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ১২/৫৭৭) লেখা হয়েছে।

৫. সংগীত এবং কবিতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিবেচনার পরিণত প্রকাশ লক্ষ করি তাঁর 'সংগীত ও কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৮৮ বঙ্গাব্দের মাঘ সংখ্যার *ভারতী* পত্রিকায়। পরে *সমালোচনা* গ্রন্থে প্রবন্ধটি সংকলিত হয়। এই প্রবন্ধে তিনি সংগীত ও কবিতার কতিপয় প্রভেদ স্বীকার করেও এই দুইয়ের মধ্যে যোগাযোগের সেতুবন্ধ রচনায় ভাবের ভূমিকা ও তাৎপর্য সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধটির শুরুতেই তিনি বলেছেন :

বলা বাহুল্য, আমরা যখন একটি কবিতা পড়ি তখন তাহাকে শুদ্ধমাত্র কথার সমষ্টিরূপে দেখি না — কথার সহিত ভাবের সম্বন্ধ বিচার করি। ভাবই মুখ্য লক্ষ্য। কথা ভাবের আশ্রয়স্বরূপ। আমরা সংগীতকেও সেইরূপ দেখিতে চাই। সংগীত সুরের রাগ রাগিণী নহে, সংগীত ভাবের রাগ রাগিণী। আমাদের কথা এই যে, কবিতা যেমন ভাবের ভাষা সংগীতও তেমনি ভাবের ভাষা। (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৬ : ১৫/৭৯-৮০)

গ্রন্থপঞ্জি

অনুপ ঘোষাল (১৪০৮)। *গানের ভুবনে*। প্রকাশক : দেবব্রত কর, কলকাতা।

আবু হেনা মোস্তফা কামাল (১৯৯১)। এই কথাটি মনে রেখ। *আবু হেনা মোস্তফা কামাল স্মারকগ্রন্থ* [সম্পা. আবদুল মান্নান সৈয়দ], বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আবুল হাসনাত (সম্পা.) (১৯৮১)। *নানা রবীন্দ্রনাথের মালা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

করুণাময় গোস্বামী (১৯৯৩)। *রবীন্দ্রসংগীত পরিক্রমা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

জয়ন্তী ভট্টাচার্য (১৩৯২)। *রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান*। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

জীবনানন্দ দাশ (২০০২)। *কবিতার কথা*। প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা।

তরুণ মুখোপাধ্যায় (২০০৬)। *কবির সুন্দর কবিতার সুন্দর*। প্রতিভাস, কলকাতা।

নীলা গোস্বামী (২০০৫)। *নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সমকালীন গীতিকার*। প্রকাশক : গৌরী চক্রবর্তী, কলকাতা।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য (১৯৬১)। কাব্যরচনা। *রবীন্দ্র-স্মৃতি* [সম্পা. বিশ্বনাথ দে], ক্যালকাটা বুক হাউজ, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (১৯৭১)। *গীতবিতান*। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০০৬)। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। প্রথম খণ্ড–অষ্টাদশ খণ্ড, ঐতিহ্য সংস্করণ তৃতীয় মুদ্রণ, ঐতিহ্য, ঢাকা।

রাজ্যেশ্বর মিত্র (১৩৬৮)। রবীন্দ্রনাথের সংগীতচিন্তা। *রবীন্দ্রায়ণ*, ২য় খণ্ড [সম্পা. পুলিনবিহারী সেন], বাক্-সাহিত্য, কলকাতা।

শঙ্খ ঘোষ (২০০৮)। *এ আমির আবরণ*। প্যাপিরাস, কলকাতা।

সাধনকুমার ভট্টাচার্য (২০০২)। *সংগীতে সুন্দর*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

শান্তিদেব ঘোষ (১৪১৫)। *রবীন্দ্রসঙ্গীত*। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

শামসুর রাহমান (১৯৯০)। রবীন্দ্রনাথের গান, আমার অনুভূতি। *নানা রবীন্দ্রনাথের মালা* [সম্পা. আবুল হাসনাত], বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

সুধাংশুশেখর শাসমল (১৯৮২)। *ধ্বনির শিল্প রবীন্দ্রসঙ্গীত*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯৯৫)। *সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রবন্ধসংগ্রহ*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সুধীর চক্রবর্তী (১৩৯৭)। *বাংলা গানের সন্ধানে*। অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

সুধীর চক্রবর্তী (২০০৮)। *গান হতে গানে*। পত্রলেখা, কলকাতা।

হায়াৎ মামুদ (১৯৮৯)। *ভ্রমি বিস্ময়ে*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।